নকল হইতে সাবধান হউন
এই বইয়ের কোণে ॐ চিহ্ন
এবং হলোগ্রাম নম্বর অবশ্য দেখিবেন

প্রাণায়াম রহস্য

স্বামী রামদেব

প্রাণায়াম রহস্য

প্রাণায়াম, ধ্যান এবং কুণ্ডলিনী
জাগরণের অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ প্রয়োগের
সচিত্র-প্রামাণিক বর্ণনা

স্বামী রামদেব

প্রকাশক : দিব্য প্রকাশন
দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্ট
কৃপালু বাগ আশ্রম, কনখল
হরিদ্বার-২৪৯৪০৮, উত্তরাঞ্চল

ই-মেল : divyayoga@rediffmail.com
ওয়েব সাইট : www.divyayoga.com
ফোন : (01334) 244107, 240008, 246737
ফ্যাক্স : (01334) 244805

প্রথম সংস্করণ : জুলাই 2006
মুদ্রক : সাই সিকিউরিটি প্রিন্টার্স লিমিটেড
152, ডি.এল.এফ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফরিদাবাদ
(হরিয়াণা)-১২১০০৩
ফোন :- 0129-2257743, 2256819 ফ্যাক্স :- 0129-2256239
ই-মেল : saipressindia@yahoo.com

বিতরক : ডায়মন্ড পকেট বুকস্ প্রাইভেট লিমিটেড
X-30, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেস-II,
নিউ দিল্লী 110020
ফোন : 011-41611861, ফ্যাক্স : 011-41611866
ই-মেল : sales@diamondpublication.com
Website : www.diamondpublication.com

ISBN 81-89235-12-5 BENGALI
0127

সুতপা রায়

সূচীপত্র

পুস্তকের শুরুতে রঙ্গীন চিত্রের পরিচয়

উড্ডীয়ান বন্ধ

অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম

অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম
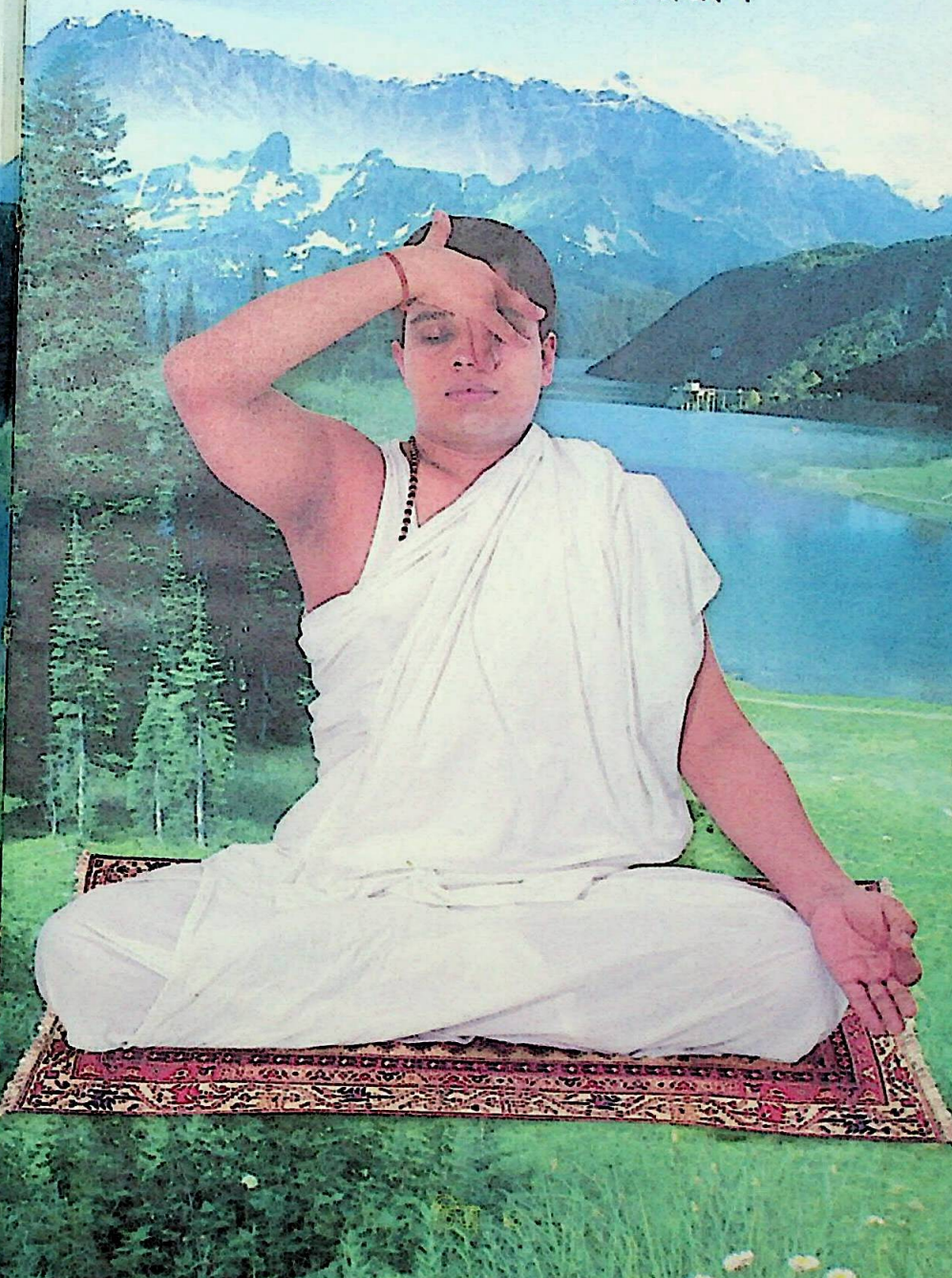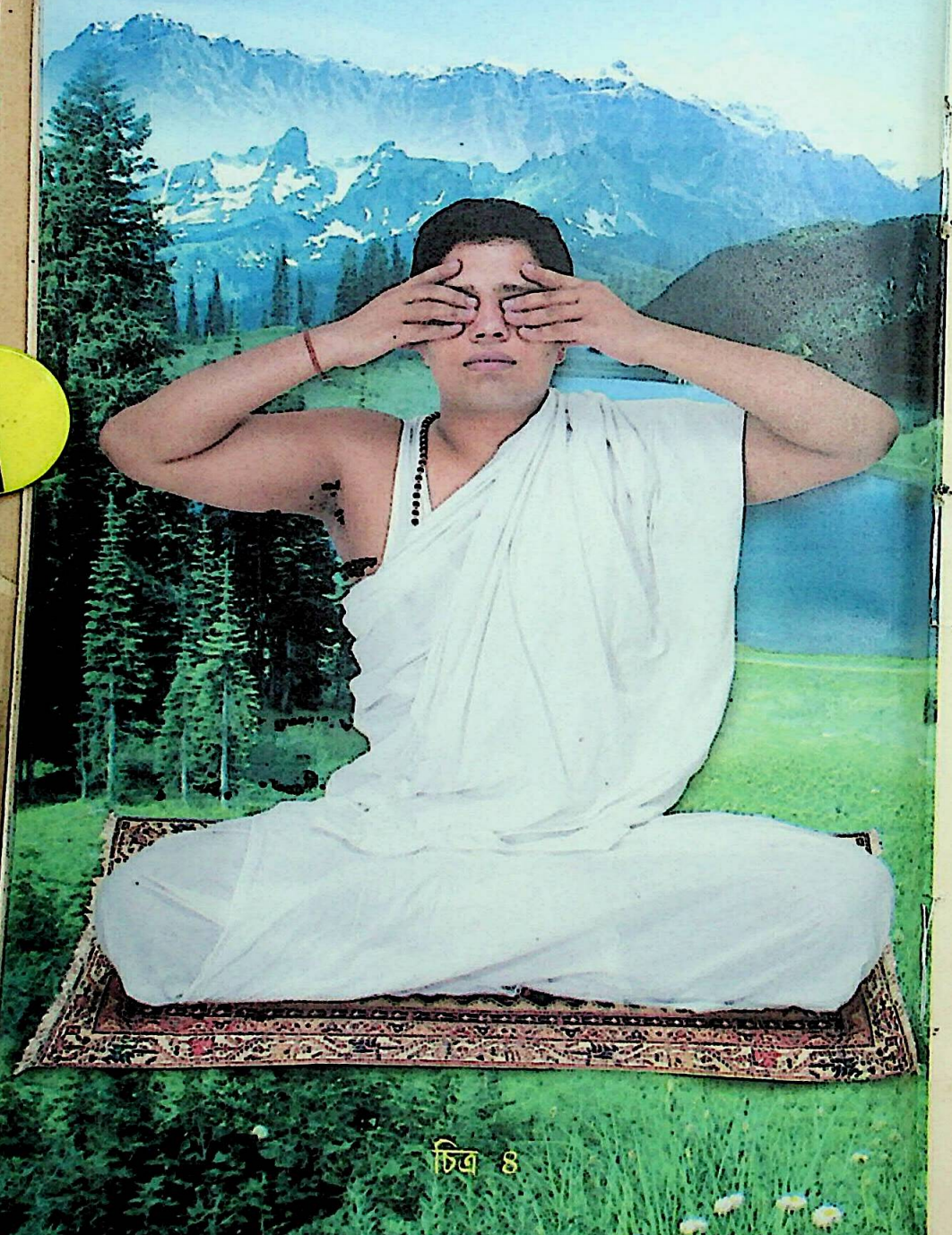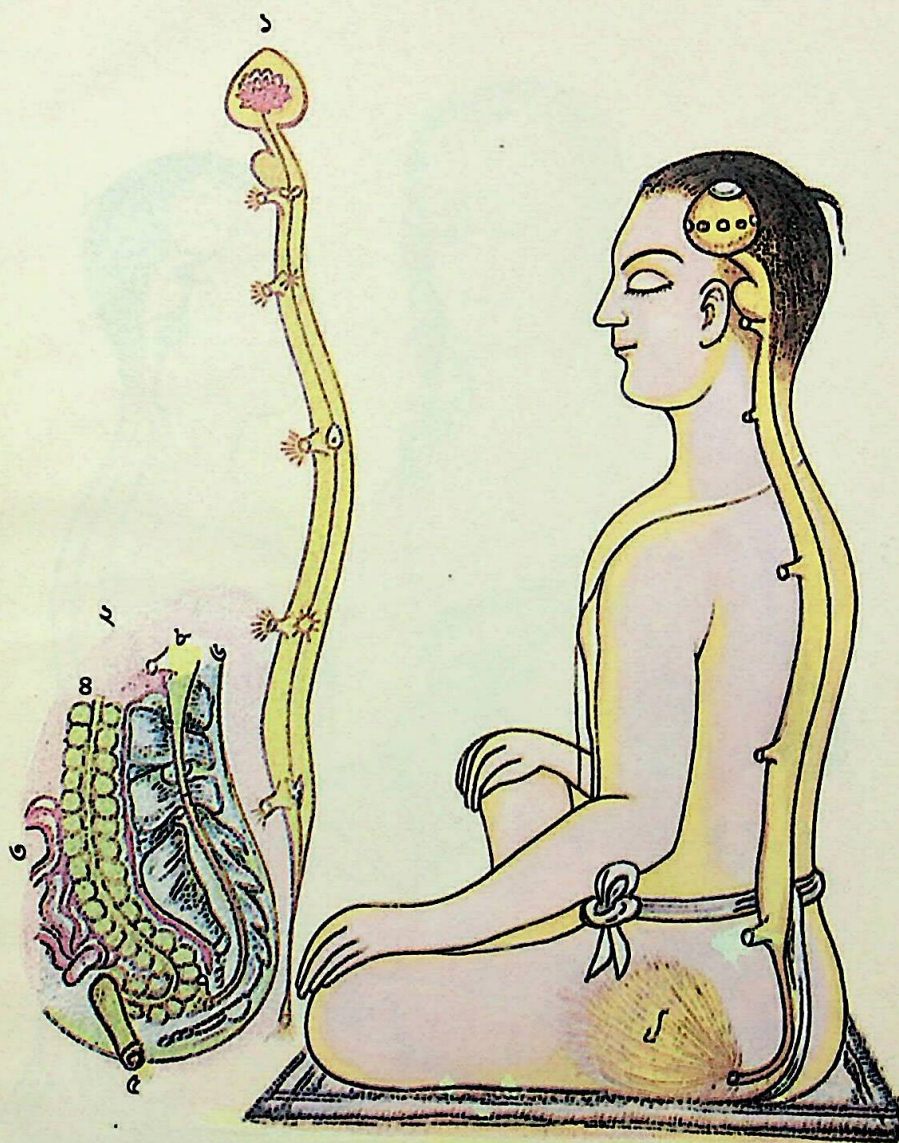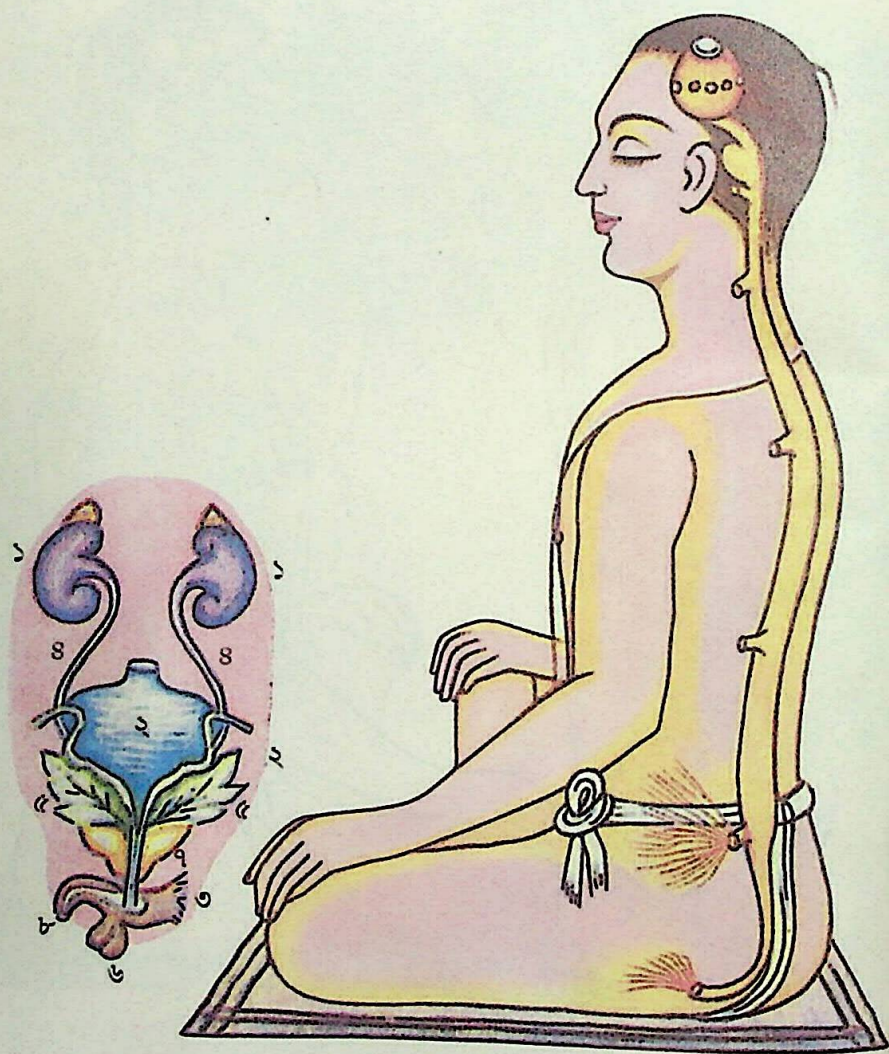
চিত্র ৪

মূলাধার চক্র

চিত্র ৫

স্বাধিষ্ঠান চক্র

চিত্র ৬

মণিপুর চক্র
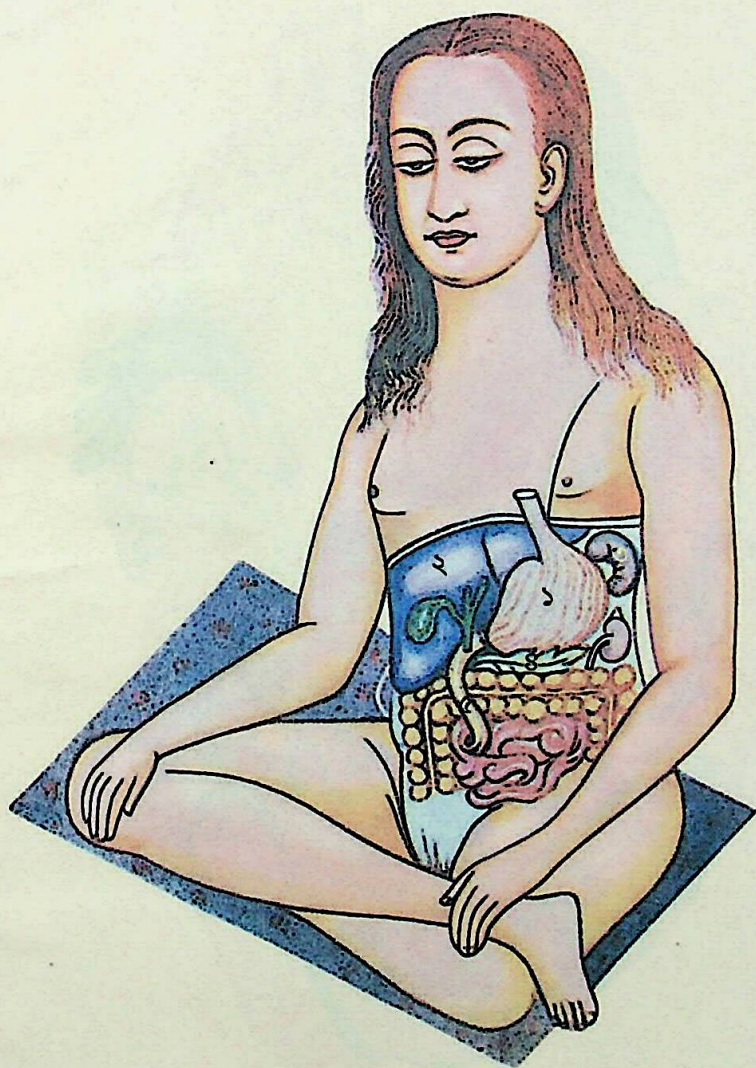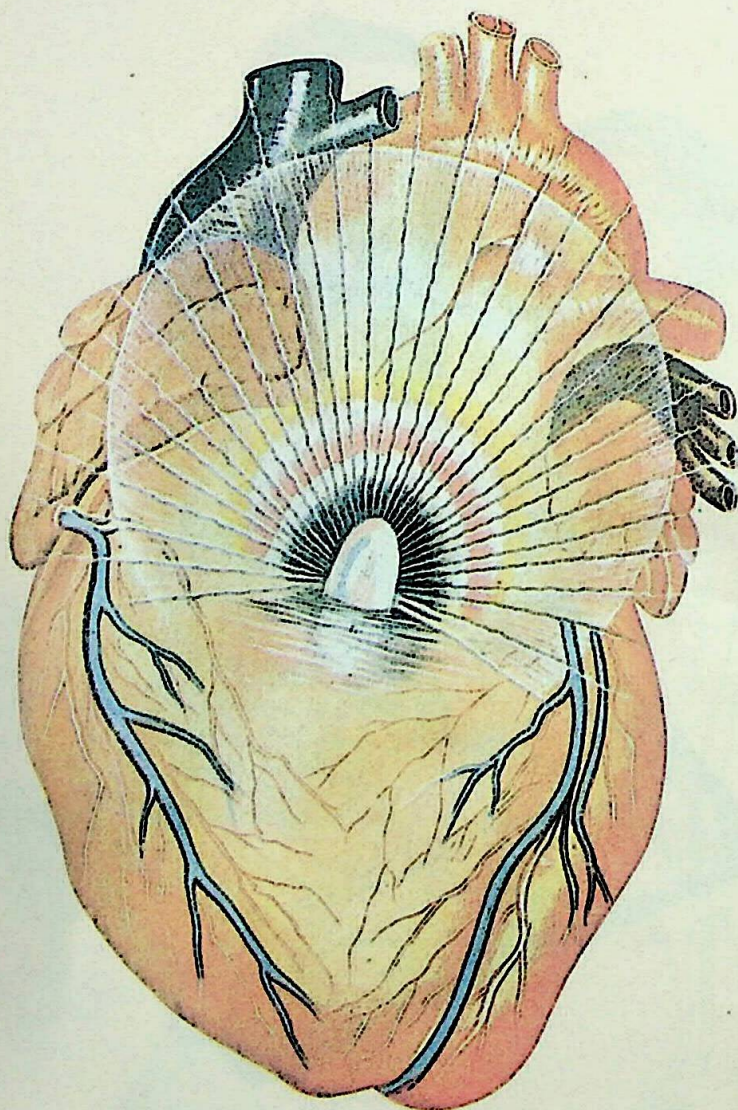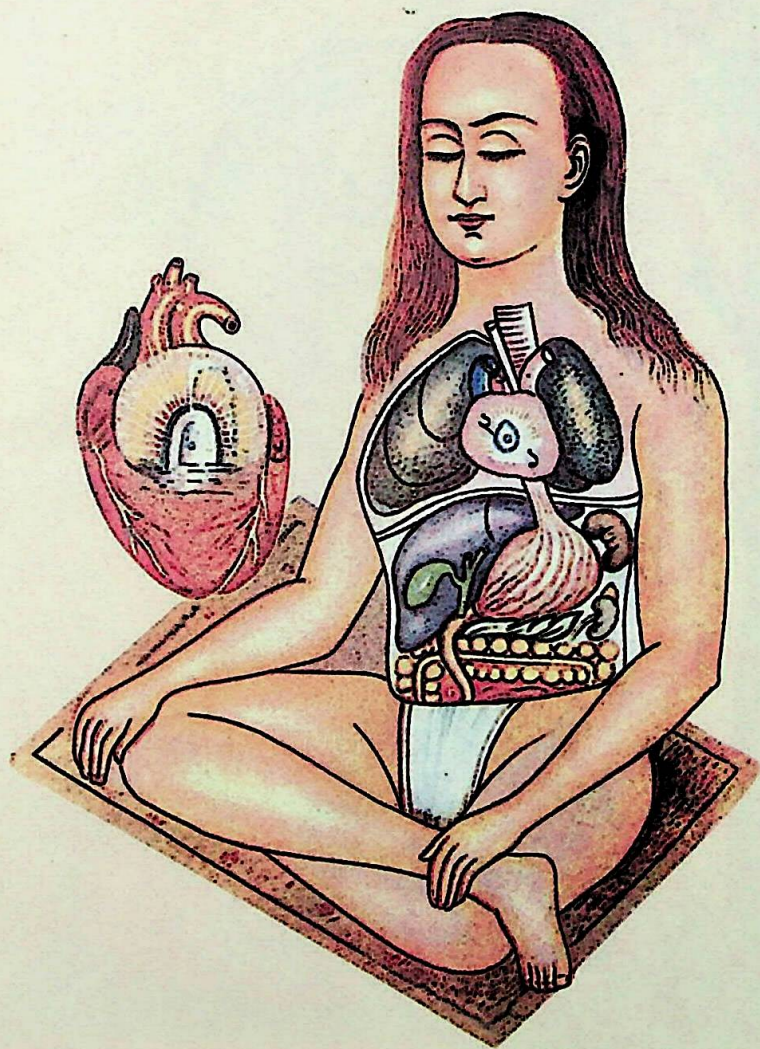
চিত্র ৭

অনাহত চক্রের বড় রূপ

চিত্র ৮

হৃদয় চক্র বা নিম্ন মনশ্চক্র

চিত্র ৯

বিশুদ্ধি চক্র

চিত্র ১০

সৌষুম্ন জ্যোতি

চিত্র ১১

চক্র দর্শন

চিত্র ১২

দিব্য দৃষ্টির রূপ

চিত্র ১৩

পিঙ্গল গণ্ডমালা আর সুষুম্নার অঙ্গ

চিত্র ১৪

গায়ত্রী ধ্যান

চিত্র ১৫

দিব্য অলোক ধ্যান ওঁ খং ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার

চিত্র ১৬
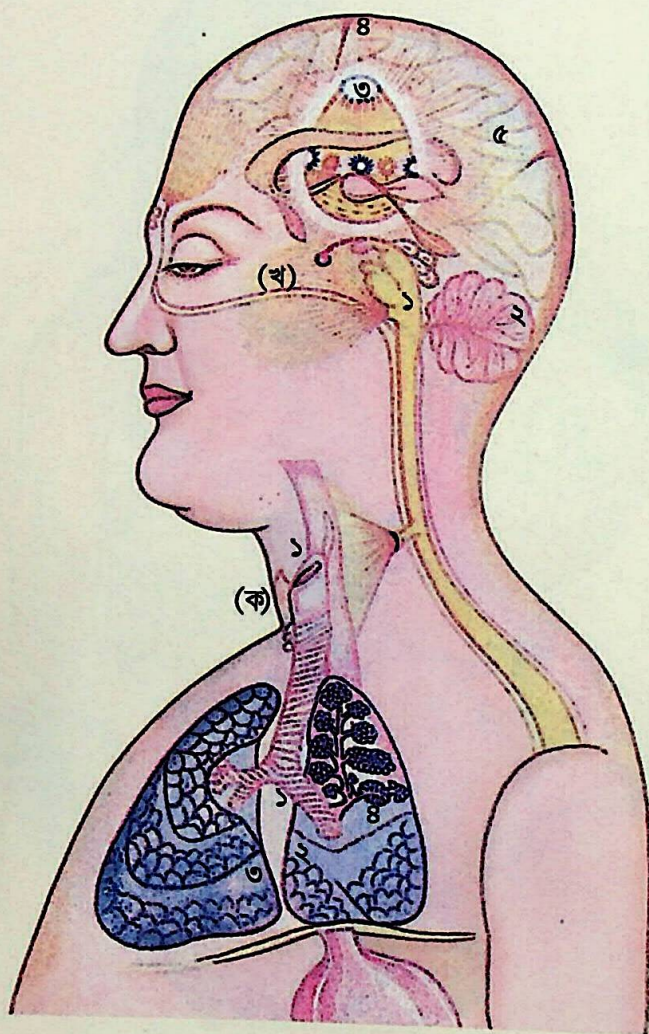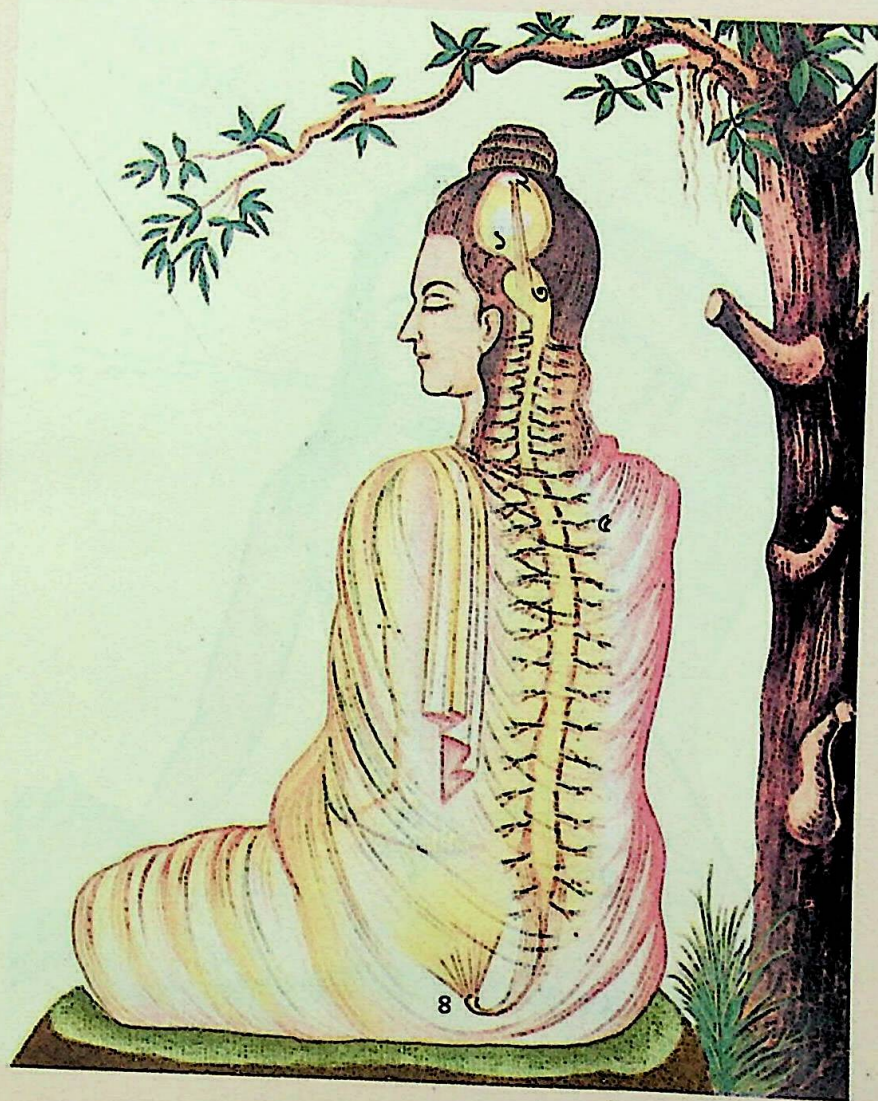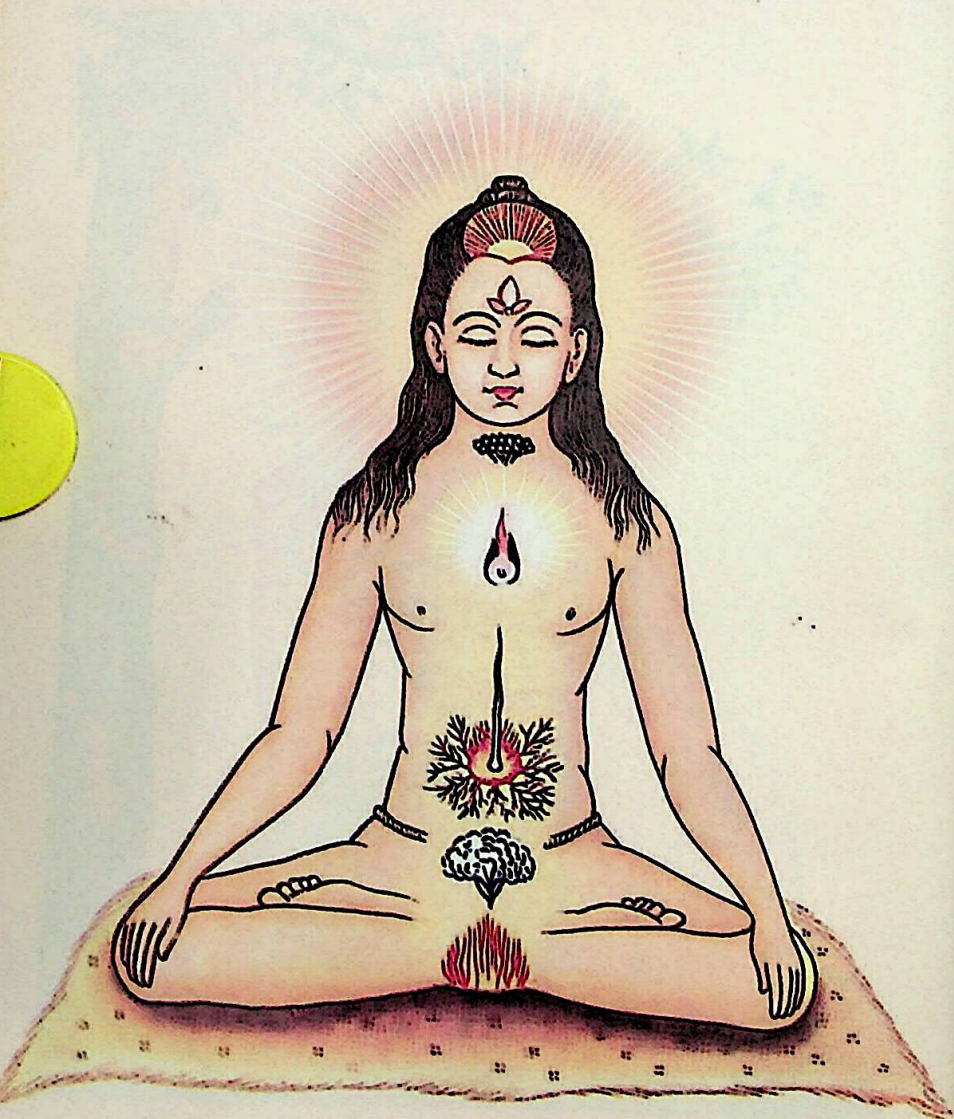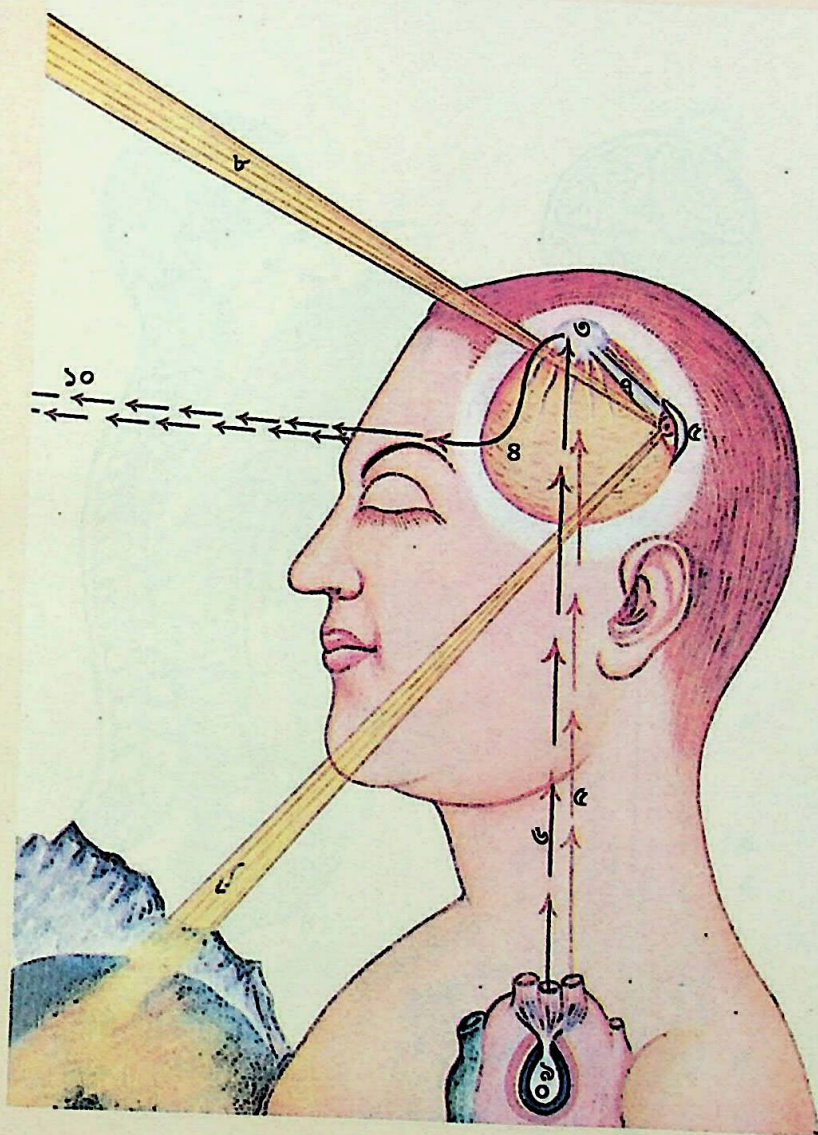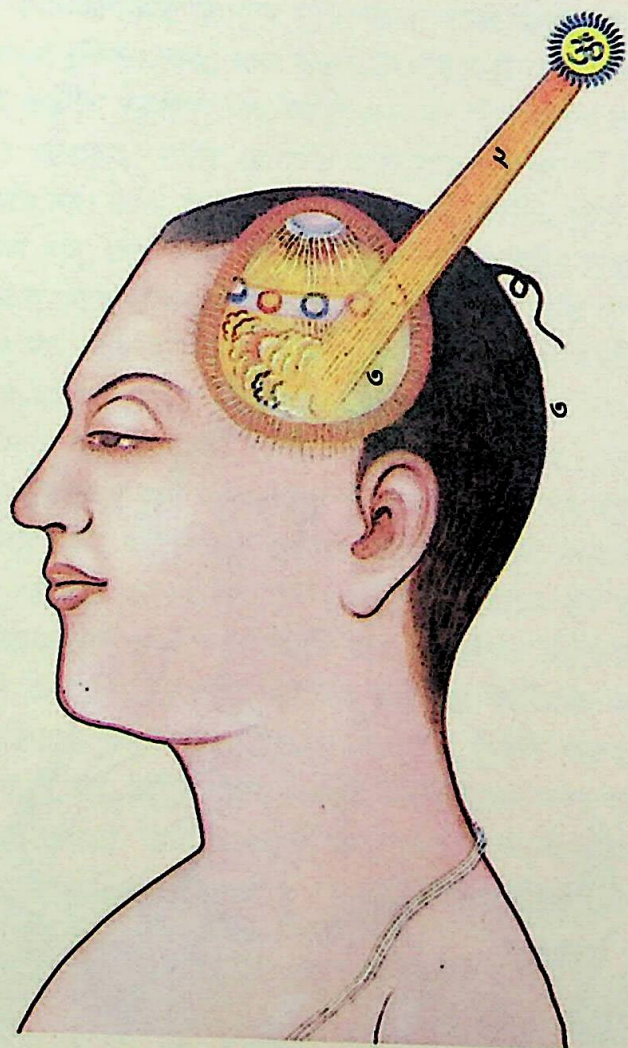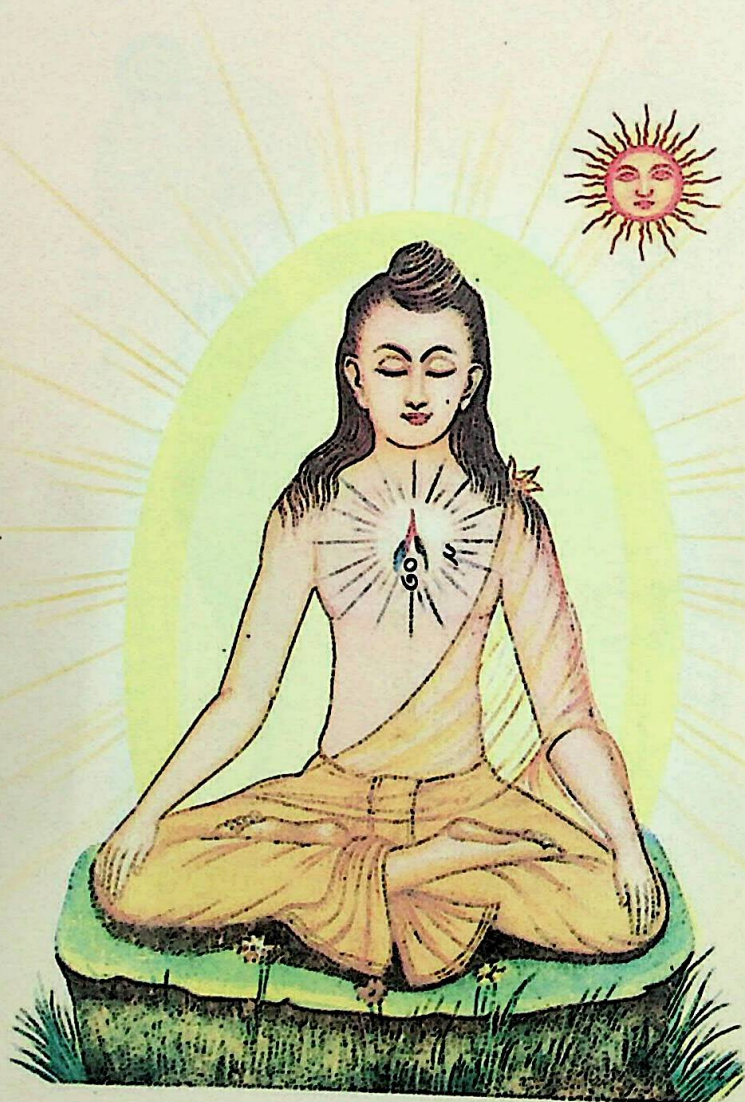
প্রকাশকের বক্তব্য

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মুলমুত্তমম্" ধর্মের অনুষ্ঠান, অর্থোপার্জন, দিব্য কামনা (শিব-সংকল্প) দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করা এবং মোক্ষের সিদ্ধি — এই চতুর্বিধ পুরুষার্থা সিদ্ধ করার জন্য সব দিক থেকে সুস্থ হওয়াটা অত্যনুত আবশ্যক। শরীর রোগগ্রস্ত হলে সুখ-শান্তি-আনন্দ কিছুই প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি যতই ধন, বৈভব, ঐশ্বর্য, আত্মীয়-কুটুম্ব এবং নাম, যশ... সব কিছু প্রাপ্ত করুক না কেন, যদি ব্যক্তির শরীর সুস্থ না থাকে, তাহলেতার কাছে জীবন এক বোঝা হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তির শরীর এবং মন সুস্থ নয়, যার মস্তিষ্কে চেতনা, দেহে স্ফূর্তি এবং ধমনীতে শক্তি নেই, যে ব্যক্তির শরীরে রক্ত সঞ্চালন ঠিক প্রকারে হয় না, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় নয় এবং যে ব্যক্তির স্নায়ুতে শক্তি নেই... সেই মানব-শরীরকে মৃতদেহই বলা হবে। মানব জীবনে নীরোগ দেহ এবং সুস্থ মন প্রাপ্ত করার জন্য আর্য়ুবেদের প্রাদুর্ভাব হয়েছে... যেটা আজও বিদ্যমান রয়েছে। শরীরের আভ্যন্তরীণ মল এবং দোষগুলোকে দূর করার জন্য এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি করে সমাধি দ্বারা পূর্ণানন্দের প্রাপ্তি করার জন্য ঋষি-মুনি এবং সিদ্ধ যোগীরা যৌগিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন। যোগ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত প্রাণায়ামের এক অতি বিশিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্ট, কনখল, হরিদ্বারের সংস্থাপক অধ্যক্ষ যোগীরাজ শ্রদ্ধেয় স্বামী রামদেব মহারাজের সান্নিধ্যে হাজার-হাজার সাধক-সাধিকা প্রতি বছর প্রাণায়াম, ধ্যানাদি যোগের বিশিষ্ঠ প্রক্রিয়াগুলোর ক্রিয়াত্মক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করে শরীরের রোগ এবং মনের দোষগুলো থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করেন। স্বামী জী মহারাজ নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা বিশ্বাস করেন যে, হাঁফানী, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিজ, মোটাপণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল-পিত্তাদি প্রায় ৮০ শতাংশ রোগ প্রাণায়ামের মাত্র ১৫-২০ মিনিটের নিয়মিত অভ্যাসে অল্প কিছুদিনের ভেতরেই দুর হয়ে

যায় এবং প্রাণায়াম দ্বারা মনের নিগ্রহ হওয়ার ফলে ধ্যান এবং সমাধির সিদ্ধিও সহজেই হয়ে পড়ে।

এই পুস্তিকা দ্বারা বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রোগী, নীরোগী গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী এবং সর্বসাধারণ লাভান্বিত হবেন... এমনটা আমরা আশা করি।

লক্ষ্মীচন্দ নাগর 'মুনি'
সেবা-নিবৃত্ত প্রাচার্য
(শিক্ষা বিভাগ, রাজস্থান সরকার)

আত্ম-নিবেদন

সিদ্ধ যোগীবৃন্দ এবং পতঞ্জলী ইত্যাদি ঋষি-মুনিবৃন্দ দ্বারা প্রতিপাদিত প্রাণায়াম হচ্ছে এক পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার দ্বারা বেশ কিছু অসাধ্য রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে-সাথে মনের শান্তি এবং সমাধির প্রাপ্তি হয়। বর্তমানে যোগের নামে কিছু তথাকথিত যোগী ব্যক্তি সমাজের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের অত্যধিক গুরুত্ব এবং উপযোগীতাকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র আসনেরই বেশী করে প্রচার এবং প্রসার করে চলেছেন। এর দ্বারা সমাজে যোগের নামে ভ্রমের সৃষ্টি হয়ে পড়ছে। এর জন্য মহর্ষি পতঞ্জলী প্রতিপাদিত অষ্টাঙ্গ যোগকে প্রচারিত করাটা অত্যন্ত আবশ্যক, নতুবা যোগের মত গরিমাময় অতি উদাত্ত শব্দও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

আমরা 'যোগ-সাধনা এবং যোগ-চিকিৎসা রহস্য' নামক পুস্তকে প্রাণায়ামকে বাদ দিয়ে যোগকে সমগ্র রূপে বর্ণনা করেছি। এই 'প্রাণায়াম রহস্য' পুস্তকে আমরা প্রাণায়াম এবং কুণ্ডলিনী জাগরণের ওপরে প্রয়োগাত্মক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। আরোগ্য লক্ষ্য ব্যক্তির এবং আধ্যাত্মিক ... দু রকম দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রাণায়ামের যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। রোগোপচারের দৃষ্টিতেও হাড়ের রোগকে বাদ দিয়ে বাকী সব রোগ আসন দ্বারা নয়, বরং প্রাণায়াম দ্বারাই দূর হতে পারে। হৃদ্‌রোগ, হাঁপানী, স্নায়ুরোগ, বাতরোগ, ডায়াবেটিজ ইত্যাদি জটিল রোগের নিবৃত্তি প্রাণায়াম ছাড়া হতে পারে নাএবং আসনও একমাত্র তখনই পূর্ণ লাভদায়ক হতে পারে, যখন আসন প্রাণায়ামপূর্বক করা হয়।

প্রাণায়াম বালক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ... সব বয়সের ব্যক্তিরাই সহজে করতে পারেন। এই পুস্তক যোগ সাধকদের অনুরোধে পৃথক রূপে প্রকাশিত করা হচ্চে। এই পুস্তককে আকর্ষক এবং উপযোগী স্বরূপ প্রদান করার জন্য সাধক এবং পরোপকারী মাননীয় শ্রী লক্ষ্মীচন্দ জী নাগরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যিনি আশ্রমের প্রকাশন সেবা

প্রকল্পগুলির সঙ্গে অহর্নিশি সংলগ্ন হয়ে রয়েছেন। যথোচিত পরামর্শের জন্য আয়ুর্বেদের মহান মনীষী এবং গবেষক পূজনীয় আচার্য শ্রী বালকৃষ্ণ জী মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রাণায়াম এবং ধ্যান বিষয়ক রঙ্গীন চিত্রসমেত এই পুস্তককে ভব্য রূপে প্রকাশিত করার জন্য সাই সিকিউরিটি প্রিন্টারস্ কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যোগীরাজ শ্রী জগন্নাথ জী পথিক, যাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অবিজ্ঞতা দ্বারা আমি নিজে অনেক কিছু প্রাপ্ত করেছি, ওনার পুস্তক 'সন্ধ্যা-যোগ আর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার' থেকে এই পুস্তকে চক্রাদির সঙ্গে সম্পর্কিত রঙ্গীন চিত্রের সংকলন করা হয়েছে। এজন্য আমি ব্রহ্মলীন সাধক পূজনীয় শ্রী পথিক জী মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আশা করি যে, যোগ সাধকের সাধনাপথে এই পুস্তক সহযোগী প্রমাণিত হবে।

— *স্বামী রামদেব*

প্রাণের অর্থ এবং গুরুত্ব

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে এক প্রমুখ তত্ত্ব বায়ু আমাদের শরীরকে জীবিত রাখা এবং বাতের রূপে শরীরের তিন দোষের মধ্যে এক দোষ, যেটা শ্বাসের রূপে আমাদের প্রাণ।

पित्त: पंगु: कफ: पंगु: पंगवोमलधातब:
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेधवत्।।
पवनस्तेषु बलवान् विभागकरणान्मत:।
रजोगुणमय: सुक्ष्म: शीतो रुक्षो लघुरचल:।।

– *শার্গধরসংহিতা ৬-২৬/২৫*

পিত্ত, কফ, দেহের অন্য ধাতু এবং মল — এই সব কিছুই পঙ্গু অর্থাৎ এই সবগুলো শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিজে থেকে যেতে পারে না। এদের বায়ুই এখানেওখানে নিয়ে যায়, ঠিক যেমনটা বায়ু আকাশে মেঘকে এদিকে-ওদিকে নিয়ে যায়। অতএব, এই তিনটে দোষ - বাত, পিত্ত এবং কফের মধ্যে বাত (বায়ু)-ই বেশি শক্তিশালী, কারণ বায়ুই সব ধাতু, মল ইত্যাদির বিভাগ করে এবং বায়ু হচ্ছে রজোগুণে যুক্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ সমস্ত শরীরের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলোয় প্রবেশকারী, শীতবীর্য, রুক্ষ, হাল্কা এবং চঞ্চল।

উপনিষদে প্রাণকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। প্রাণ শরীরের প্রতিটা কণায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, শরীরের কর্মেন্দ্রিয়গুলো তো একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ে, বিশ্রাম করতে লাগে... কিন্তু এই প্রাণ-শক্তি কখনো ঘুমোয় না বা বিশ্রামও করে না। রাত-দিন অনবরত কাজ করে চলে... 'চরৈবেতি-চরৈবতি' এটাই হচ্ছে এর মূল মন্ত্র। যতক্ষণ প্রাণ শক্তি চলতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণেদের আয়ু থাকে। যখন প্রাণ-শক্তি এই শরীরে কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখন আয়ুও শেষ হয়ে পড়ে। প্রাণ যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই জীবন, প্রাণীকে ততক্ষণ পর্যন্তই

জীবিত বলা হয়। প্রাণশক্তি কাজ করা বন্ধ করে দিলে প্রাণীকে মৃত বলা হয়। এই শরীরে প্রাণই হচ্ছে সব কিছু। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণ হচ্ছে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং উপযোগী জীবনী তত্ত্ব। প্রাণের আশ্রয়ই হচ্ছে জীবন। প্রাণের কারণেই পিণ্ড *(দেহ)* এবং ব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বা বজায় রয়েছে। প্রাণের অদৃশ্য শক্তি দ্বারাই সম্পূর্ণ বিশ্বের সঞ্চালন কার্য চলছে। আমাদের এই দেহও প্রাণের এনার্জী এবং শক্তি দ্বারাই ক্রিয়াশীল হয়। আমাদের শরীরের অন্নময় কোষ (Physical Body) এবং দৃশ্য শরীরও প্রাণময় কোষ (Ethrical Body)-এর অদৃশ্য শক্তি দ্বারাই সঞ্চালিত হয়। আহার গ্রহণ না করেও ব্যক্তি বহু বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। প্রাণ-শক্তিই হচ্ছে আমাদের জীবনী-শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধগ-শক্তির আধার। সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি (Glands), হৃদয়, ফুসফুস, মস্তিষ্কএবং মেরুদণ্ড সমেত সম্পূর্ণ শরীরকে প্রাণই সুস্থ এবং এনার্জীতে ভরপুর করে তোলে। প্রাণের শক্তি দ্বারাই চোখে দৃষ্টিশক্তি, কানে শ্রবণশক্তি, নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি, বাণীতে সরসতা, মুখশ্রীতে আভা, কান্তি এবং তেজ, মস্তিষ্ক জ্ঞানশক্তি এবং উদরে পাচনশক্তি রয়েছে। এজন্য উপনিষদে ঋষি বলেছেন ঃ -

"প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।"

"প্রাণস্যেদং বশে সর্বং যৎ ত্রিদিবে প্রতিষ্ঠিতম্"

মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি।

- প্রশ্নোপনিষদ্ 2/13

পৃথিবী, দ্যু এবং অন্তরীক্ষ — এই তিন লোকে যা কিছু রয়েছে, সেবসব কিছুই প্রাণের বশে রয়েছে। হে প্রাণ! যেমন মাতা স্নেহ ভাব দ্বারা পুত্রের রক্ষা করেন, ঠিক তেমনই তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমাদের শ্রী *(জাগতিক সম্পদ)* এবং প্রজ্ঞা *(মানসিক এবং আত্মিক ঐশ্চর্য)* প্রদান কর।

প্রাণের প্রকার

প্রাণ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দ্বারা অথবা প্রকৃতি রূপী মায়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রাণ হচ্ছে গত্যাত্মক। এই প্রাণের গত্যাত্মকতা সদা গতিশীল বায়ুর ভেতরে পাওয়া যায়... সুতরাং গৌণী বৃত্তি দ্বারা বায়ুকে প্রাণ বলা হয়। শরীরগত স্থানভেদে একই বায়ু প্রাণ, আপন ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হয়। প্রাণ-শক্তি এক। এই প্রাণকে স্থান এবং কার্যভেদে বিভিন্ন নামে জানা যায়। আমাদের দেহে মুখ্য রূপে পাঁচ প্রাণ এবং পাঁচ উপপ্রাণ আছে।

পঞ্চ প্রাণের অবস্থিতি এবং কার্য্য ঃ

১. প্রাণ ঃ শরীরে কণ্ঠ থেকে শুরু করে হৃদয় পর্যন্ত যে বায়ু কাজ করে, তাকে 'প্রাণ বলা হয়।

কার্য্য ঃ এই প্রাণ নাসিকা-পথ, কণ্ঠ, স্বরযন্ত্র, বাক-ইন্দ্রিয়, অন্ননালী, শ্বাস-তন্ত্র, ফুসফুস এবং হৃদয়কে ক্রিয়াশীলতা এবং শক্তি প্রদান করে।

২. অপান ঃ নাভির নীচ থেকে শুরু করে পায়ের আঙুল পর্যন্ত যে প্রাণ কার্য্যশীল থাকে, তাকে 'অপান' বলা হয়।

৩. উদান ঃ কণ্ঠের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেহে অবস্থিত প্রাণকে 'উদান' বলা হয়।

কার্য্য ঃ কণ্ঠের ওপরে শরীরের সমস্ত অঙ্গ নেত্র, নাসিকা এবং সম্পূর্ণ মুখমন্ডলকে তেজ এবং আভা প্রদান করে। পিচ্যুটরী এবং পিনিয়াল গ্রন্থি সমেত গোটা মস্তিষ্ককে 'উদান' প্রাণ ক্রিয়াশীলতা প্রদান করে।

৪. সমান ঃ হৃদয়ের নীচ থেকে শুরু করে নাভি পর্যন্ত শরীরে ক্রিয়াশীল প্রাণকে 'সমান' বলা হয়।

কার্য্য ঃ যকৃৎ, অন্ত্র, প্লীহা এবং অগ্নাশয় সমেত সম্পূর্ণ পাচনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ কার্য প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫. ব্যান ঃ এই জীবনী প্রাণ-শক্তি গোটা শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এ শরীরের সমস্ত গতিবিধিকে নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। সব অঙ্গ মাংসপেশী, তন্তু, সন্ধি এবং নাড়িগুলোর ক্রিয়াশীলতা এবং শক্তি এই 'ব্যান প্রাণ'-ই প্রদান করে।

এই পাঁচ প্রাণের অতিরিক্ত শরীরে 'দেবদত্ত', 'নাগ, 'কৃংকল', 'কূর্ম' এবং 'ধনঞ্জয়' নামক পাঁচটি উপপ্রাণ আছে, যেগুলো ক্রমশঃ হাঁচি, চোখের পলক ফেলা, হাই তোলা, চুলকোন, হেঁচকি তোলা ইত্যাদি ক্রিয়াগুলোকে সঞ্চালিত করে।

প্রাণগুলোর কার্য প্রাণময় কোষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এবং প্রাণায়াম এই সব প্রাণেদের এবং প্রাণময় কোষকে শুদ্ধ, সুস্থ এবং নীরোগ রাখার মুখ্য কাজ করে। এজন্য প্রাণায়ামের সর্বাধিক গুরুত্ব এবং উপযোগও রয়েছে। প্রাণায়ামের অভ্যাস শুরু করার আগে তার পৃষ্ঠভূমির বিষয়ে জ্ঞান থাকাটা অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং প্রাণায়াম রূপী প্রাণসাধনার প্রকরণের শুরুতে প্রাণগুলোর সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে প্রাণদর্শন তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

প্রাণদর্শন তালিকা

মুখ্য প্রাণ		গৌণ প্রাণ		চক্র	তত্ত্ব
নাম	স্থান	নাম	স্থান		
অপান	কোমর, পায়ু	কূর্ম	চোখের পাতায়	মূলাধার	পৃথিবী
ব্যান	স্বাধিষ্ঠান চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পুরো শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত	ধনঞ্জয়	অস্থি, মাংস, ত্বক, রক্ত, জ্ঞানতত্ত্ব, চুল ইত্যাদিতে	স্বাধিষ্ঠান	জল
সমান	নাভি এবং আশপাশের বিস্তার	কৃংকল্	হোজরীর ওপর এবং শ্বাসনলির ধারে	মণিপুর	অগ্নি (তেজ)
প্রাণ	হৃদয়ের আশাপাশের অংশ	নাগ	নাভির একটু ওপরে	অনাহত	বায়ু
উদান	হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ভ্রূকুটির মধ্যে এবং মস্তিষ্কে	দেবদত্ত	শ্বাসনলির ওপরের অংশে, গলায়	বিশুদ্ধি	আকাশ

শরীরে অবস্থিত পঞ্চকোষ

মানুষের আত্মা পাঁচ কোষের সঙ্গে সংযুক্ত... যাদের পঞ্চ শরীরও বলা হয়। এই পাঁচ কোষ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

১. **অন্নময় কোষ** ঃ এটা হচ্ছে পঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের প্রথম ভাগ। অন্নময় কোষ ত্বক থেকে শুরু করে অস্থি পর্যন্ত পৃথ্বী তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। আহার-বিহারের শুচিতা, আসন-সিদ্ধি এবং প্রাণায়াম করলে অন্নময় কোষের শুদ্ধি হয়।

২. **প্রাণময় কোষ** ঃ শরীরের দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে প্রাণময় কোষ। শরীর এবং মনের মাঝে প্রাণ হচ্ছে মাধ্যম। জ্ঞান কর্মের সম্পাদনের সমস্ত কার্য্য প্রাণ দিয়ে তৈরী প্রাণময় কোষেই করে। শ্বাসোচ্ছাসের রূপে ভেতরে-বাইরেআসতে-যেতে থাকা প্রাণকে স্থান এবং কার্য্যের ভেদে ১০ প্রকারের মানা হয়। যেমন — ব্যান, উদান, প্রাণ, সমান এবং অপান হচ্ছে মুখ্য প্রাণ এবং ধনঞ্জয়, নাগ, কূর্ম, কৃংকল এবং দেবদত্ত হচ্ছে গৌণ প্রাণ বা উপপ্রাণ। প্রাণ মাত্রেরই মুখ্য কার্য্য হচ্ছে - আহারের যথোচিত পরিপাক করা, শরীরে রসগুলোকে সমান ভাবে বিভক্ত করা এবং সেগুলোকে বিতরণ করে দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলোর তর্পণ করা, রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র ঘুরে-ঘুরে মল নিষ্কাষন করা, যেগুলো দেহের বিভিন্ন ভাগে রক্তের সঙ্গে এসে মেশে। দেহ দ্বারা বিভিন্ন ভোগের উপভোগ করাও এর কাজ। প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা প্রাণময় কোষের কার্য্যশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. **মনোময় কোষ** ঃ সূক্ষ্ম শরীরের এই প্রথম এবং ক্রিয়াপ্রধান ভাগকে মনোময় কোষ বলা হয়। মনোময় কোষের অন্তর্গত রয়েছে মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্ত... যাদের অন্তঃকরণ চতুষ্টয় বলা হয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে, যাদের সম্পর্ক বাহ্য জগতের ব্যবহারের সঙ্গে বেশি করে থাকে।

৪. বিজ্ঞানময় কোষ ঃ সূক্ষ্ম শরীরের দ্বিতীয় এবং জ্ঞানপ্রধান ভাগকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা হয়। এর মুখ্য তত্ত্ব হচ্ছে জ্ঞানযুক্ত বৃদ্ধি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক বিজ্ঞানময় কোষকে ঠিকভাবে জেনে-বুঝে সঠিক রূপে আচার-বিচার করেন এবং অসত্য, ভ্রম, মোহ, আসক্তি ইত্যাদি থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিরন্তর ধ্যান এবং সমাধির অভ্যাস করে চলেন, সেই ব্যক্তি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রাপ্ত করে নেন।

৫. আনন্দময় কোষ ঃ এই কোষকে হিরণ্যময় কোষ, হৃদয়গুহা, হৃদয়াকাশ, কারণশরীর, লিঙ্গশরীর ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। এই কোষ আমাদের শরীরের হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত থাকে। আমাদের আভ্যন্তরীণ জগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক বেশি থাকে, বাহ্য জগতের সঙ্গে খুব কম। আমাদের জীবন, আমাদের স্থূল শরীরের অস্তিত্ব এবং সংসারের সমস্ত ব্যবহার এই কোষের ওপরেই আশ্রিত থাকে। নির্বীজ সমাধির প্রাপ্তি হলে সাধক আনন্দময় কোষে জীবনমুক্ত হয়ে সদা আনন্দময় থাকেন।

প্রাণ-সাধনা

প্রাণের মুখ্য দ্বার হচ্ছে নাসিকা। নাসিকা-ছিদ্র দ্বারা আসা-যাওয়া করতে থাকা শ্বাস-প্রঃশ্বাস হচ্ছে জীবন এবং প্রাণায়ামের আধারস্বরূপ। শ্বাস-প্রঃশ্বাসরূপী রজ্জুর আশ্রয় নিয়ে এই মন দেহগত আভ্যন্তরীণ জগতে প্রবিষ্ট করে সাধককে সেখানকার দিব্যতা অনুভব করাবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাণায়াম বিধির আবিষ্কার প্রাচীন ঋষি-মুনিরা করেছিলেন। যোগদর্শন অনুযায়ী — 'তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতির্বিচ্ছেদ : প্রাণায়াম:' (যোগদর্শন ২/৪৯) অর্থাৎ আসনের সিদ্ধি হলে শ্বাস-প্রঃশ্বাসের গতিকে আটকানোই হচ্ছে প্রাণায়াম। যে বায়ু শ্বাস নিলে বাইরে থেকে শরীরের ভেতরে ফুসফুসে পৌঁছয়, তাকে শ্বাস (Inspiration) এবং শ্বাস ছাড়লে যে বায়ু শরীরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়, তাকে (Expiration) বলা হয়। প্রাণায়াম করার জন্য শ্বাসকে শরীরের ভেতরে নেওয়াকে *'পূরক'*, শ্বাসকে শরীরের ভেতরে আটকে রাখাকে *'কুম্ভক'* এবং শ্বাসকে বাইরে ছাড়াতে *'রেচক'* বলা হয়। শ্বাসকে বাইরেই আটকে রাখাকে *'বাহ্যকুম্ভক'* বলা হয়. এই প্রকার প্রাণায়াম করার জন্য পূরক, কুম্ভক, রেচক এবং বাহ্যকুম্ভক ক্রিয়া করা হয়। ভালো মতন প্রাণায়াম-সিদ্ধ হয়ে ওঠার পরে যখন বিধিপূর্বক প্রাণায়ামের অভ্যাস করা হয়, তখন "ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्" (যোগদর্শন 2/52) অনুযায়ী জ্ঞানরূপী প্রকাশকে আচ্ছাদিত করা অজ্ঞানের আবরণ সরে যায় এবং 'धारणासु च योग्यता मनसः' (যোগদর্শন 2/53) অনুযায়ী প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়ে ওঠার পরে মনে যোগের ষষ্ঠ অঙ্গ ধারণার যোগ্যতা এসে যায়। যখন শ্বাস শরীরে প্রবেশ

করে, তখন শুধুমাত্র বায়ু বা অক্সিজেনই প্রবেশ করে না... এক অখণ্ড দিব্য শক্তিও শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে, যা শরীরে জীবনীশক্তিকে বজায় রাখে। প্রাণায়াম করার অর্থ শুধুমাত্র শ্বাস নেওয়া আর ছাড়াই হয় না... বরং বায়ুর সাথে সাথে প্রাণ-শক্তি বা জীবনী-শক্তি (Vital Force) গ্রহণ করাও হয়। এই জীবনী-শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং সদা বিদ্যমান থাকে। যাকে আমরা ঈশ্বর, গড (God) বা খোদা ইত্যাদি যে নামই প্রদান করি না কেন, সেই পরম শক্তি একই থাকে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং যুক্ত হয়ে থাকার অভ্যাস করাই হচ্ছে প্রাণায়াম।

প্রাণায়ামের গুরুত্ব এবং লাভ

প্রাণের আয়াম *(নিয়ন্ত্রণ)*-ই হচ্ছে প্রাণায়াম। আমাদের শরীরে যতগুলো চেষ্টা হয়, সেগুলোর প্রত্যেকটার প্রাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে জীবন আর মৃত্যুর যে অটুট সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে রয়েছে, সেটাও প্রাণের সংযোগের দ্বারাই রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় 'জীবন' শব্দ 'জীব-প্রাণধারণে' ধাতু থেকে তৈরী হয়েছে আর 'মৃত্যু' শব্দ তৈরী হয়েছে 'মৃঙং প্রাণত্যাগ' থেকে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে — 'প্রাণাপানৌ মৃত্যোর্মা পাত স্বাহা' অর্থাৎ প্রাণ আর আপন... এই দুটো আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করুক। মনু মহারাজ প্রাণায়ামের বিষয়ে বলেছেন ঃ-

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ।।

(মনু ৬/৭১)

যেমন অগ্নি ইত্যাদিতে পোড়ালে সোনা ইত্যাদি ধাতু মল, বিকার নষ্ট হয়ে পড়ে... ঠিক তেমনই প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং মনের সব দোষ দূর হয়ে পড়ে।

হঠযোগ প্রদীপিকায় বলা হয়েছে ঃ-

प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति।
आचार्याणान्तु केषाञ्चिदन्यत् कर्म न सम्मतम्।।

(হঠ প্র. ২/৩৮)

গোরক্ষ শতক অনুযায়ী আসন দ্বারা যোগীর রজোগুণ, প্রাণায়াম দ্বারা পাপনিবৃত্তি এবং প্রত্যাহার দ্বারা মানসিক বিকার দূর করা উচিত।

आसनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्।
विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा।।

প্রাণ এবং মনের মধ্যে সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ। প্রাণ থেমে গেলে মন আপনা থেকেই একাগ্র হয়ে পড়ে।

চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেত্। *(হ. প্র. ২/২)*

প্রাণায়াম করলে মনের ওপরে আসা অসৎ, অবিদ্যা এবং ক্লেশ রূপী তমসের আবরণ পাতলা হয়ে আসে। পরিশুদ্ধ হয়ে পড়া মনে ধারণা *(একাগ্রতা)* আপন থেকেই হতে লাগে এবং ধারণা দ্বারা যোগের উন্নত স্থিতি ধ্যান এবং সমাধির দিকে এগিয়ে চলা যায়।

যোগাসন দ্বারা আমরা স্থূল শরীরের বিকৃতি দূর করি। সূক্ষ্ম শরীরের ওপরে যোগাসনের থেকে প্রাণায়ামের বেশি প্রভাব পড়ে। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম শরীরই নয়, স্থূল শরীরের ওপরেও প্রাণায়ামের বিশেষ প্রভাব প্রত্যক্ষ রূপে হয়। আমাদের শরীরে ফুসফুস, হৃদয় এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে।

স্থূল রূপে প্রাণায়াম হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের এক পদ্ধতি, যার দ্বারা ফুসফুস বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নত হয়ে ওঠার ফলে আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ুর প্রাপ্তি হয়। শরীর-বিজ্ঞান অনুযায়ী মানব-শরীরের দুটো ফুসফুস হচ্ছে শ্বাসকে নিজের ভেতরে নেবার সেই যন্ত্র, যাতে ভরা বায়ু সমস্ত শরীরে পৌঁছে অক্সিজেন প্রদান করে এবং বিভিন্ন অবয়ব থেকে উৎপন্ন মলিনতা *(কার্বোনিক গ্যাস)*-কে বাইরে বের করে দেয়। এই ক্রিয়া ঠিক মতন হতে থাকবে ফুসফুস মজবুত হয়ে ওঠে এবং রক্ত শোধন কার্য চলতে থাকে।

প্রায়ই অধিকাংশ ব্যক্তি গভীর শ্বাস নিতে অভ্যস্ত থাকেন না, যার ফলে ওনাদের ফুসফুসের এক-চতুর্থাংশ ভাগই কাজ করে... বাকী তিন-চতুর্থাংশ ভাগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। মৌমাছির চাকের মত ফুসফুসে প্রায় সাত কোটি তিরিশ লক্ষ *'স্পঞ্জ'*-য়ের মত কোষ্ঠক থাকে। সাধারণ হাল্কা শ্বাস নিলে তাদের ভেতরে প্রায় দু কোটি ছিদ্রেই সঞ্চার হয়, বাকী পাঁচ কোটি তিরিশ লক্ষ ছিদ্র প্রাণবায়ু না পৌঁছনোর ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। পরিমাণস্বরূপ, সেগুলোর মধ্যে জড়তা আর মল অর্থাৎ বিজাতীয় দ্রব্য জমা হতে থাকে, যার ফলে ব্যক্তি ক্ষয় *(টি.বি.)*, কাশি, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

এই প্রকার ফুসফুসের কার্য্যপদ্ধতির অপূর্ণতা রক্ত-শুদ্ধির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে আর পরিণামস্বরূপ অকাল মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তির দীর্ঘ আয়ুর জন্য প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ-বায়ুর নিয়মন করে সহজেই করা যেতে পারে। এই বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণ-বায়ুর বিজ্ঞানের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ব্যক্তি নিজের এবং অন্যের স্বাস্থ্যকে সুব্যবস্থিত করে সুখী এবং আনন্দপূর্ণ জীবনের পূর্ণ লাভ উঠিয়ে নিজের আয়ুকে বাড়াতে পারে। এই কারণেই সনাতন ধর্ম, শুভ কার্য্যে এবং সন্ধ্যা-উপাসনার নিত্য-কর্মে *'প্রাণায়াম'*-কে এক আবশ্যক ধর্ম, কৃত্যের রূপে সম্মিলিত করে।

উদ্বেগ, চিন্তা, ক্রোধ, নিরাশা, ভয় এবং কামুকতা ইত্যাদি মনোবিকারের সমাধান *'প্রাণায়াম'* দ্বারা সহজেই করা যেতে পারে। শুধু এই নয়, মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে স্মরণ-শক্তি, কুশাগ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ, ধারনা, প্রজ্ঞা, মেধা ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ঠ্যের বৃদ্ধি করে *'প্রাণায়াম'* দ্বারা দীর্ঘজীবি হয়ে উঠে জীবনের বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্ত করা যেতে পারে।

প্রাণায়াম করলে দীর্ঘশ্বসনের অভ্যাসও আপনা থেকেই হতে লাগে। ভগবানের তরফ থেকে আমরা যে জীবন প্রাপ্ত করেছি, তাতে প্রাণ শ্বাস খুবই কম সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই জন্মে যে যেমন কর্ম করে, সেই অনুযায়ী সে পরের জন্ম প্রাপ্ত করে।

সতি মুলে তদ্বিপাকো জ়াত্যায়ুর্ভোগা: (যোগদর্শন ২/১৩)

পুণ্য বা পুণ্য কর্মের ফলস্বরূপই ব্যক্তি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ইত্যাদি যোনিতে জন্ম, আয়ু আর ভোগ প্রাপ্ত করে। প্রাণায়াম করা ব্যক্তি নিজের শ্বাসের প্রয়োগ খুব কম করেন; এজন্য তিনি দীর্ঘায়ুও হন। এমনিতেও এই সৃষ্টিতে যে প্রাণী যত কম শ্বাস নেয়, সে তত বেশী দীর্ঘায়ু হয়। এই জিনিসটা আমরা নীচে উল্লেখিত তালিকা থেকে আরও ভালো ভাবে জানতে পারব।

প্রাণী	১ মিনিটে শ্বাস সংখ্যা	প্রাণী	১ মিনিটে শ্বাস সংখ্যা
(১) পায়রা	৩৪	(৮) ছাগল	২৪
(২) পাখী	৩০	(৯) বেড়াল	২৪
(৩) হাঁস	২২	(১০) সাপ	১৯
(৪) বাঁদর	৩০	(১১) হাতী	২২
(৫) কুকুর	২৮	(১২) মানুষ	১৫
(৬) শুয়োর	৩০	(১৩) কচ্ছপ	০৫
(৭) ঘোড়া	২৬		

এই সব প্রাণীদের মধ্যে যে প্রাণী যে গতিতে শ্বাস নেয়, সেই অনুযায়ী তার আয়ুও হয়... এমনটা আমরা প্রত্যক্ষ রূপে দেখতে পাই। ৪০০ বছর আয়ুরও কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায়। যোগাভ্যাসী পুরুষের শ্বাস সংখ্যা শুরুতে ৮ এবং প্রাণায়াম আর ধ্যানের নিয়মিত অভ্যাসে তাঁর শ্বাস সংখ্যা ৪ পর্যন্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যোগাভ্যাসী পুরুষ ৪০০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত করতে পারেন।

প্রাণায়ামের কিছু নিয়ম

(১) প্রাণায়াম শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্মল স্থানে করা উচিত। যদি সম্ভব হয়, তো জলের কাছে বসে অভ্যাস করুন।

(২) শহরে, যেখানে প্রদূষণের প্রভাব বেশি হয়, সেখানে প্রাণায়াম করার আগেই ঘি এবং গুগ্গুল দ্বারা সেই স্থানটাকে সুগন্ধিত করে তুলুন। যদি খুব বেশি করতে না পারেন, তাহলে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান।

(৩) প্রাণায়ামের জন্য সিদ্ধাসন, বজ্রাসন বা পদ্মাসনে বসাই হচ্ছে উপযুক্ত। বসার জন্য যে আসনের প্রয়োগ করবেন, সেটা যেন বিদ্যুতের কু-চালক হয়... যেমন কম্বল বা কুশাসন ইত্যাদি।

(৪) শ্বাস সর্বদা নাক দ্বারাই নেওয়া উচিত। এতে শ্বাস ফিল্টার হয়ে ভেতরে ঢুকবে। দিনের বেলাও শ্বাস নাক দ্বারাই নেওয়া উচিত। এতে শরীরের তাপমাত্রাও ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ির দ্বারা সুব্যবস্থিত থাকে এবং বিজাতীয় তত্ত্ব নাকের ছিদ্রেই আটকে থাকে।

(৫) যোগাসনের মত প্রাণায়াম করার জন্য কমপক্ষে ৪-৫ ঘন্টা আগে ভোজন করে নেওয়া উচিত। প্রাতঃকালে শৌচাদি থেকে নিবৃত্ত হয়ে যোগাসন করার আগে যদি প্রাণায়াম করা যায়, তাহলে সেটা সর্বোত্তম হয়। শুরুতে ৫-১০ মিনিটই অভ্যাস করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে এক ঘন্টা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রাণায়াম সর্বদা এক নির্দিষ্ট সংখ্যাতেই করুন, কম বা বেশি করবেন না। যদি প্রাতকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পেট পরিস্কার না হয়, তাহলে রাতে ঘুমোতে যাবার আগে হরিতকী চূর্ণ এবং ত্রিফলা চূর্ণ গরম জলের সঙ্গে সেবন করুন। কিছু দিন কপালভাতি প্রাণায়াম করলে কোষ্ঠকাঠিন্য আপনা থেকেই দুর হয়ে পড়বে।

(৬) প্রাণায়াম করার সময় মন শান্ত এবং প্রসন্ন থাকা উচিত। এমনিতে প্রাণায়াম দ্বারাও মন শান্ত, প্রসন্ন এবং একাগ্র হয়ে ওঠে।

(৭) প্রাণায়ামকে নিজের-নিজের প্রকৃতি এবং ঋতু অনুযায়ী করা উচিত। কিছু প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের গরম ভাব বেড়ে ওঠে, আবার কিছু প্রাণায়ামে ঠান্ডা ভাব কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

(৮) প্রাণায়াম করার সময় যদি ক্লান্তি অনুভব করেন, তাহলে পরের প্রাণায়াম শুরু করার আগে ৫-৬ স্বাভাবিক দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বিশ্রাম করে নেওয়া উচিত।

(৯) গর্ভবতী মহিলা, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, জ্বরে আক্রান্ত এবং অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের প্রাণায়াম করা উচিত নয়। রোগী ব্যক্তির প্রাণায়ামের সঙ্গে দেওয়া সতর্কতাগুলোকে মাথায় রেখে প্রাণায়াম করা উচিত।

(১০) প্রাণায়মের দীর্ঘ অভ্যাসের জন্য পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের পালন করা উচিত। ভোজন সাত্ত্বিক হওয়া উচিত। দু, ঘি এবং ফলের সেবন লাভকারী হয়।

(১১) প্রাণায়ামে শ্বাসকে জোর করে আটাকনো উচিত নয়। প্রাণায়াম করার জন্য শ্বাসকে শরীরের ভেতরে নেওয়াকে *'পূরক',* শ্বাসকে শীররের ভেতরে আটকে রাখাকে 'কুম্ভক' এবং শ্বাসকে বাইরে ছাড়াকে *'রেচক'* এবং শ্বাসকে বাইরেই আটকে রাখাকে 'বাহ্যকুম্ভক' বলা হয়।

(১২) প্রাণায়ামের অর্থ কেবলমাত্র পূরক, কুম্ভক এবং রেচকই নয়, বরং এটা শ্বাস এবং প্রাণেদের গতিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সন্তুলিত করে তুলে মনকে স্থির এবং একাগ্র করার অভ্যাসও বটে।

(১৩) প্রাণায়ামের আগে বেশ কয়েকবার 'ওঁ'-য়ের লম্বা নাদপূর্ণ উচ্চারণ করা এবং ভজন-কীর্তন করা উচিত। এমনটা করলে মন শান্ত এবং বিচাররহিত করাটা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রাণায়াম করার সময় গায়ত্রী, প্রণব (ওঁ)-য়ের জপ করা আধ্যাত্মিক রূপে বিশেষ গুণকারী হয়।

(১৪) প্রাণায়াম করার সময় মুখ, চোখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গের ওপরে কোন প্রকারের টেনশন না এনে সহজ অবস্থায় রাখা উচিত। প্রাণায়ামের অভ্যাস করার সময় গ্রীবা, মেরুদণ্ড, বক্ষ, কোটি সর্বদা সোজা রেখে বসুন, একমাত্র তখনই প্রাণায়ামের অভ্যাস যথাবিধি ফলপ্রদ হবে।

(১৫) প্রাণায়মের অভ্যাস ধীরে-ধীরে কোন রকমের উতলা ভাব ছাড়া, ধৈর্য্য সহকারে, সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত।

যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্ বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
তথৈব বশ্যতে বায়ুঃ অন্যথা হন্তি সাধকম্ঃ।।

সিংহ, হাতী বা বাঘের মত হিংস্র জংলী প্রাণীদের অত্যন্ত ধীরে-ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বশ করতে হয়। উতলা হয়ে উঠলে সেই সব হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে প্রশিক্ষকের ক্ষতিও করতে পারে। ঠিক সেই প্রকার প্রাণায়ামকেও ধীরেধীরে বাড়িয়ে চলা উচিত।

(১৬) প্রাণায়াম যথাসম্ভব স্নানাদি থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধ্যান-উপাসনার আগে করা উচিত। প্রাণায়াম করার পরে যদি স্নান করতে হয়, তো ১৫-২০ মিনিট পরে স্নান করতে পানের। পুস্তক পড়ে কখনো নিজে-নিজে প্রাণায়ামের অভ্যাস করার চেষ্টা করতে যাবেন না। কোন অভিজ্ঞ আচার্যের অধীনে প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা ইত্যাদির শিক্ষা নেওয়া উচিত।

(১৭) সকল প্রকারের প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করার জন্য নীচে উল্লেখিত গীতার শ্লোক মুখস্থ করে সেটাকে স্মরণ করতে-করতে নিজের ব্যবহারে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন ঃ

'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।'

অর্থাৎ—যে ব্যক্তির আহার-বিহার ঠিক নয়, যে ব্যক্তির সাংসারিক কাজ করার কোন নির্দিষ্ট দিনচর্যা নেই এবং যে ব্যক্তির ঘুমোন-জাগার দিনচর্যাও নির্দিষ্ট নয়, এমন ব্যক্তি যদি যোগাভ্যাস করার দম্ভ করে, তাহলে যোগাভ্যাস দ্বারা তার কোন লাভই হতে পারে না, সেই ব্যক্তি যোগাভ্যাস করার পরেও দুঃখীই থেকে যায়।

প্রাণায়ামে উপযোগী বন্ধত্রয়

যোগাসন, প্রাণায়াম এবং বন্ধ দ্বারা আমাদের শরীর থেকে যে শক্তির বহির্গমন হয়, তাকে বাদা দিয়ে অন্তর্মুখী করে তোলে। বন্ধের অর্থই হচ্ছে বাঁধা, বাধা প্রদান করা। এই বন্ধ প্রাণায়ামে অত্যন্ত সহায়ক হয়। বন্ধ ছাড়া প্রাণায়াম অপূর্ণ থেকে যায়। এই সব বন্ধের বর্ণনা নীচে ক্রমানুসারে দেওয়া হল।

জালন্ধর বন্ধ ঃ

পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে সোজা হয়ে বসে শ্বাসকে ভেতরে পুরে নিন। দুটো হাত হাঁটুর ওপরে থাকবে। এবার থুতনীকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে কণ্ঠকূপের সঙ্গে লাগানোকে জালন্ধর বন্ধ বলে। দৃষ্টি ভ্রুমধ্যে স্থির করে রাখুন। বুক সামনের দিকে টান-টান হয়ে থাকবে। এই বন্ধ কণ্ঠস্থানের নাড়ি জালের সমূহকে বেঁধে রাখে।

লাভ ঃ

১. কণ্ঠ মধুর, সুরেলা এবং আকর্ষক হয়।
২. কণ্ঠের সংকোচ দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা নাড়িগুলো বাঁধা পড়ার ফলে সুষুম্নায় প্রাণের প্রবেশ হয়।
৩. এই বন্ধ গলার সব প্রকারের রোগে লাভ প্রদান করে। থায়রয়েড, টনসিল ইত্যাদি রোগে এই বন্ধের অভ্যাস করা যেতে পারে।
৪. এই বন্ধ বিশুদ্ধি চক্রকে জাগ্রত করে তোলে।

উড্ডীয়ান বন্ধ ঃ

যে ক্রিয়ায় প্রাণ ওপরের দিকে উঠে, উত্তিত হয়ে সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে, তাকে উড্ডীয়ান বন্ধ বলা হয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাতকে সহজভাবে দুই হাঁটুর ওপরে রাখুন। শ্বাস বাইরে ছেড়ে পেটকে ঢিলা করে ছেড়ে দিন। জালন্ধর বন্ধ লাগিয়ে দিন। যথাশক্তি করার পরে আবার একবার শ্বাস নিয়ে আগের ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন। শুরুতে তিন বার করাই যথেষ্ঠ। ধীরে-ধীরে অভ্যাস বাড়ানো উচিত।

এই প্রকার পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসেও এই বন্ধ লাগান *(দেখুন চিত্র ১)*

লাভ ঃ

১. এই বন্ধ পেট সম্বন্ধীয় সব রোগকে দূর করে।

২. প্রাণের জাগ্রত করে তুলে মণিপুর চক্রের শোধন করে।

মূলবন্ধ ঃ

সিদ্ধাসন বা পদ্মাসনে বসে বাহ্য বা আভ্যন্তর কুম্ভক করতে করতে, পায়ুপ্রদেশ এবং মূত্রেন্দ্রিয়কে ওপরের দিকে আকর্ষিত করুন। এই বন্ধে নাভির নীচের অংশে টান পড়বে। এই বন্ধ বাহ্য কুম্ভকের সঙ্গে লাগাতে সুবিধা হয়। এমনিতে যোগাভ্যাসী সাধকেরা এই বন্ধ বেশ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত সহজভাবে লাগিয়ে রাখতে পারেন। দীর্ঘ অভ্যাস কারো সান্নিধ্যেই করা উচিত।

লাভ ঃ

১. এই বন্ধের দ্বারা অপান বায়ুর উর্দ্ধগমন হয়ে প্রাণের সাথে একতার সৃষ্টি হয়। এই প্রকার এই বন্ধ মূলাধার চক্রকে জাগ্রত করে তুলে কুণ্ডলিনী জাগরণে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

২. কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অর্শ দূর করতে এবং জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করার জন্য এই বন্ধ অতি উত্তম।

৩. এই বন্ধ বীর্যকে উদ্ধমুখী করে তোলে, সুতরাং ব্রহ্মচর্যের জন্য এই বন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহাবন্ধ ঃ

পদ্মাসন ইত্যাদি যে কোন একটা ধ্যানাত্মক আসেন বসে তিনটে বন্ধকে এক সঙ্গে লাগানোকে মহাবন্ধ বলা হয়। এই বন্ধের দ্বারা সেই সব লাভ প্রাপ্ত হয়, যেগুলো পূর্ব নির্দিষ্ট। কুম্ভকে এই তিনটে বন্ধ লাগে।

লাভ ঃ

১. এই বন্ধেরফলে প্রাণ উর্দ্ধগামী হয়।

২. বীর্যের শুদ্ধি এবং শক্তিবৃদ্ধি হয়।

৩. মহাবন্ধ দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নার সঙ্গম প্রাপ্ত হয়।

প্রাণায়ামের জন্য বসার বিধি

যখনই আপনি প্রাণায়াম করবেন, আপনার মেরুদণ্ডের হাড় সোজা থাকা উচিত। এর জন্য আপনি যে কোন ধ্যানাত্মক আসনে বসে পড়ুন... যেমন ধরুন — সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সুখাসন, বজ্রাসন ইত্যাদি। আপনি যদি কোন আসনে বসতে না পারেন, তাহলে চেয়ারেও সোজা হয়ে বসে আপনি প্রাণায়াম করতে পারেন, কিন্তু মেরুদণ্ডের হাড়কে সর্ব দা সোজা রাখুন। আজকাল লোকেরা চলতে-ফিরতে বা প্রাতঃভ্রমণের সময়ও ঘুরতে-ঘুরতে নাড়ি শোধন ইত্যাদি প্রাণায়াম করতে থাকেম... এটা প্রাণায়াম করার ভুল পদ্ধতি। এর ফলে যে কোন সময় প্রচণ্ড ক্ষতিও হতে পারে। প্রাণায়াম করলে প্রাণশক্তির উত্থান হয় এবং মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত চক্রগুলোর জাগরণ হয়। সুতরাং, প্রাণায়াম করার সময় সোজা হয়ে বসাটা অত্যন্ত আবশ্যক। সোজা হয়ে বসে প্রাণায়াম করলে মনেরও নিগ্রহ হয়।

প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ সাত প্রক্রিয়া

যদিও প্রাণায়ামের বিভিন্ন বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেক প্রাণায়ামের নিজস্ব একটা বিশেষত্ব আছে, তবুও সব প্রাণায়ামের অভ্যাস ব্যক্তি প্রতি দিন করতে পারেন না। সুতারং, আমরা গুরুদেব কৃপা এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতি এবং আধ্যাত্মিক বিধি দ্বারা প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে সাতটি প্রক্রিয়ায় ক্রমবদ্ধ এবং সময়বদ্ধ করেছি। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় প্রায় ২০ মিনিটের মত লাগে। প্রাণায়ামের এই পূর্ণ অভ্যাস করলে ব্যক্তি যেসব লাভ প্রাপ্ত করেন, সেগুলো হচ্ছে এই প্রকার ঃ

১. বাত, পিত্ত এবং কফ... ত্রিদোষের শমন হয়।
২. পাচন তন্ত্র পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সমস্ত প্রকারের উদর রোগ দূর হয়।
৩. হৃদয়, ফুসফুস এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগ দূর হয়।
৪. মোটাপণ, ডায়াবেটিজ, কোলেষ্ট্রল, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, অম্লপিত্ত, শ্বাস রোগ, এ্যালার্জী, মাইগ্রেন, রক্তচাপ, কিডনীর রোগ, পুরুষ এবং মহিলাদের সমস্ত যৌন রোগ ইত্যাদি সাধারণ রোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সারের মত ভয়ঙ্কর সব সাধ্য-অসাধ্য রোগ দূর হয়।
৫. শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অত্যধিক বেড়ে ওঠে।
৬. বংশানুগত ডায়াবেটিজ এবং হৃদরোগ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৭. চুল পড়ে যাওয়া এবং পেকে যাওয়া, মুখের ত্বকে ভাঁজ পড়া, নেত্রজ্যোতির বিকার, স্মৃতি দৌর্বল্য ইত্যাদি থেকে বাঁচা যায়।
৮. মুখে এক আভা, তেজ এবং কান্তি আসে।
৯. চক্রের শোধন, ভেদন এবং জাগরণ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তির *(কুণ্ডলনী জাগরণ)*-য়ের প্রাপ্তি হয়।
১০. মন অত্যন্ত স্থির, শান্ত আর প্রসন্ন এবং উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং

ডিপ্রেশন ইত্যাদি রোগ থেকে বাঁচা যেতে পারে.

১১. ধ্যান আপনা থেকে লাগতে থাকে এবং বেশ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

১২. স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের সমস্ত রোগ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ এবং অহংকার ইত্যাদি দোষ নষ্ট হয়।

১৩. শরীরগত সমস্ত বিকার, বিজাতীয় তত্ত্ব, টক্সিনস্ নষ্ট হয়।

১৪. নকারাত্মক বিচার সমাপ্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাণায়ামের অভ্যাস করতে থাকা ব্যক্তি সদা সকারাত্মক বিচার, চিন্তন এবং উৎসাহে ভরে থাকেন।

প্রথম প্রক্রিয়া — ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম

কোন ধ্যানাত্মাক আসনে সুবিধানুসার বসে দুই নাক দিয়ে শ্বাসকে পুরো ভেতরে ডায়াফ্রাম পর্যন্ত ভরা এবং বাইরেও পুরো শক্তির সঙ্গে ছাড়াকে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম বলে। এই প্রাণায়ামকে নিজের-নিজের সামর্থ অনুযায়ী তিন প্রকারে করা যেতে পারে। মৃদু গতিতে, মধ্যম গতিতে এবং তীব্র গতিতে। যেসব ব্যক্তির ফুসফুস এবং হৃদয় দুর্বল, তাঁদের মৃদু গতিতে রেচক এবং পূরক করে এই প্রাণায়াম করা উচিত। সুস্থ ব্যক্তি এবং পুরোন অভ্যাসীর ধীরে-ধীরে শ্বাস-প্রঃশ্বাসের গতি বাড়িয়ে মধ্যম এবং তারপর তীব্র গতিতে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করা উচিত। এই প্রাণায়ামকে ৩-৫ মিনিট পর্যন্ত করা উচিত।

ভস্ত্রিকার সময় শিবসংকল্প ঃ

ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামে শ্বাসকে ভেতরে ভরে মনে বিচার *(সংকল্প)* করা উচিত যে, ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান দিব্য শক্তি, এনার্জী, পবিত্রতা, শান্তি এবং আনন্দ ইত্যাদি যা কিছু শুভ, সেসব প্রাণের সাথে আমার দেহে প্রবিষ্ট হচ্চে। আমি দিব্য শক্তিতে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছি। এই প্রকার দিব্য সংকল্পের সঙ্গে করা প্রাণায়াম বিশেষ লাভপ্রদ হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ

১. যেসব ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ আছে, তাঁদের তীব্র গতিতে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করা উচিত নয়।

২. এই প্রাণায়াম করার সময় যখন শ্বাস ভেতরে ভরবেন, তখন পেটকে ফোলানো উচিত নয়। শ্বাস ডায়াফ্রাম পর্যন্তই ভরুন, এতে পেট ফুলবে না, পাঁজর পর্যন্ত শুধু বুকই ফুলবে।
৩. গ্রীষ্ম ঋতিতুতে এই প্রাণায়াম অল্প মাত্রায় করুন।
৪. কফের অধিকতা বা সাইনাস ইত্যাদি রোগের কারণে যেসব ব্যক্তির দুই নাসাছিদ্র ঠিক মতন খোলা থাকে না, সেই সব ব্যক্তিদের প্রথমে ডান স্বরকে বন্ধ করে বাঁ দিক দিয়ে রেচক এবং পূরক করা উচিত। তারপর বাঁ দিক বন্ধ করে ডান দিক দিয়ে যথাশক্তি মৃদু, মধ্যম বা তীব্র গতিতে রেচক এবং পূরক করা উচিত। তারপর শেষে, দুই স্বর ইড়া এবং পিঙ্গলা দ্বারা রেচক এবং পূরক করতে করতে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম করুন।
৫. এই প্রাণায়ামকে তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত প্রতিদিন অবশ্য করুন।
৬. প্রাণায়ামের ক্রিয়া করার সময় চোখ দুটোকে বন্ধ রাখুন এবং মনে প্রত্যেক শ্বাস-প্রঃশ্বাসের সঙ্গে ওঁ-য়ের মানসিক চিন্তন এবং মনন করা উচিত।

লাভ ঃ

১. সর্দি-কাশি, এল্যার্জি, শ্বাসরোগ, হাঁপানী, পুরোন, শ্লেষ্মা, সাইনাস ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের কফ রোগ দূর হয়। ফুসফুস শক্তিশালী হয়ে ওটে এবং শুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত করার ফলে হৃদয় আর মস্তিষ্কেরও আরোগ্য লাভ হয়।
২. থায়রয়েডএবং টনসিল ইত্যাদি গলার সমস্ত রোগ দূর হয়।
৩. ত্রিদোষ সম হয়। রক্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং শরীরে বিষাক্ত, বিজাতীয় দ্রব্য শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।
৪. প্রাণ এবং মন স্থির হয়। এই প্রাণায়াম প্রাণোত্তান এবং কুণ্ডলিনী জাগরণে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া — কপালভাতি প্রাণায়াম ঃ

কপাল অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং ভাতির অর্থ হচ্ছে — দীপ্তি, আভা, তেজ,

প্রকাশ ইত্যাদি। যে প্রাণায়াম করলে মস্তিষ্ক অর্থাৎ কপালে আভা কান্তি এবং তেজ বেড়ে ওঠে, সেই প্রাণায়াম হচ্ছে — কপালভাতি। এই প্রাণায়ামের বিধি ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামের থেকে একটু আলাদা। ভস্ত্রিকায় রেচক এবং পূরকে সমান রূপে শ্বাস-প্রঃশ্বাসের ওপরে চাপ দেওয়া হয়... অন্য দিকে কপালভাতিতে শুধুমাত্র রেচক অর্থাৎ শ্বাসকে জোর দিয়ে বাইরে ছাড়ার ওপরে মনোযোগ দেওয়া হয়। শ্বাসকে ভেতরে ভরার চেষ্টা করা হয় না, উল্টে সহজ রূপে যতটা শ্বাস ভেতরে চলে যায়, যেতে দেওয়া হয়, পূর্ণ একাগ্রতা শ্বাসকে বাইরে ছাড়ার ওপরেই দেওয়া হয়। এমনটা করলে পেটেও স্বাভাবিক রূপে আকুঞ্চন এবং প্রসারণের ক্রিয়া হতে থাকে এবং মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান এবং মণিপুর চক্রের ওপরে বিশেষ জোর পড়ে। এই প্রাণায়ামকে কম পক্ষে ৫ মিনিট পর্যন্ত অবশ্যই করা উচিত।

কপালভাতির সময় শিবসংকল্প ঃ

কপালভাতি প্রাণায়াম করার সময় মনে এমন বিচার আনা উচিত যে, আমি যেই মুহূর্তে শ্বাস বাইরে ছাড়ছি, সেই মুহূর্তে প্রঃশ্বাসের সঙ্গে আমার শরীরের সমস্ত রোগ বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে পড়ছে। যে ব্যক্তির যে শারীরিক রোগ আছে, সেই দোষ বা বিকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদিকে বাইরে বের করে দেবার ভাবনা করতে-করতে রেচক করা উচিত। এই প্রকার রোগ নষ্ট হওয়ার বিচার শ্বাস ছাড়ার সময় করার এক বিশেষ লাভ হয়।

সময় ঃ তিন মিনিট থেকে শুরু করে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করা উচিত। শুরুতে কপালভাতি প্রাণায়াম করার সময় যখনই ক্লান্তি অনুভব হবে, একটু বিশ্রাম করে নেবেন। এক থেকে দু মাস অভ্যাস করার পর এই প্রাণায়ামকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে এই প্রাণায়ামের পূর্ণ সময়। শুরুতে পেট আর কোমরে যন্ত্রণা হতে থাকে। সেই যন্ত্রণা ধীরে-ধীরে আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে পিত্ত প্রকৃতির ব্যক্তি প্রায় দু মিনিট পর্যন্ত এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করুন।

লাভ ঃ

১. মস্তিষ্ক এবং মুখমন্ডলে কান্তি, তেজ, আভা এবং সৌন্দর্য বেড়ে ওঠে।

২. সমস্ত প্রকারের কফ রোগ, হাঁফানী, শ্বাসরোগ, এ্যালার্জী, সাইনাস ইত্যাদি রোগ দূর হয়ে পড়ে।

৩. হৃদয়, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের সমস্ত রোগ দূর করে।

৪. মোটাপণ, ডায়াবেটিজ, গ্যাস কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্লপিত্ত, কিডনী এবং প্রোষ্টেটের সঙ্গে সম্পর্কিত সব রোগ নিশ্চিতরূপে দূর হয়।

৫. কোষ্ঠকাঠিন্যের মত ভয়ঙ্কর রোগ এই প্রাণায়াম নিয়মিত রূপে প্রতি দিন প্রায় ৫ মিনিট পর্যন্ত করলে দূর হয়ে পড়ে। এই প্রাণায়াম দ্বারা ডায়াবেটিজকে বিনা ওষুধে নিয়মিত করা যেতে পারে এবং পেট ইত্যাদির বেড়ে ওঠা ওজন এক মাসে ৪ থেকে ৮ কিলো পর্যন্ত কম করা যেতে পারে। হৃদয়ের শিরাগুলোয় আসা অবরোধ *(ব্লকেজ)* খুলে যায়।

৬. মন স্থির, শান্ত এবং প্রসন্ন থাকে। নকারাত্মক বিচার নষ্ট হয়... যার ফলে ডিপ্রেশন ইত্যাদি রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৭. চক্রগুলোর শোধন এবং মূলাধার চক্র থেকে শুরু করে সহস্রার চক্র পর্যন্ত সমস্ত চক্রে এক দিব্য শক্তির সঞ্চারণ হতে লাগে।

৮. এই প্রাণায়াম করলে আমাশয়, অগ্নাশয় *(প্যান্‌ক্রিয়াজ)*, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, প্রোষ্টেট এবং কিডনীর রোগে বিশেষ রূপে আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। বেশ কিছু আসন করার পরেও পেটের রোগে যেসব লাভ পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র এই প্রাণায়াম করলেই সেই সব আসনের থেকেও বেশি লাভ প্রাপ্ত হয়। দুর্বল অন্ত্রগুলোকে সবল বানাবার জন্যও এই প্রাণায়াম হচ্ছে সর্বোত্তম।

তৃতীয় প্রক্রিয়া - বাহ্য প্রাণায়াম *(ত্রিবন্ধের সঙ্গে)* ঃ

১. সিদ্ধাসন বা পদ্মাসনে বিধিপূর্বক বসে শ্বাসকে একই বারে যথাশক্তি বাইরে বের করে দিন।

২. শ্বাস বাইরে ছেড়ে মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ এবং জালন্ধর বন্ধ লাগিয়ে

শ্বাসকে যথাশক্তি বাইরেই আটকে রাখুন।

৩. যখন শ্বাস নেবার ইচ্ছা হবে, তখন বন্ধগুলোকে সরিয়ে ধীরে-ধীরে শ্বাস নিন।

৪. শ্বাস ভেতরে নিয়ে সেটাকে না আটকেই আবার আগের মত শ্বসন ক্রিয়া দ্বারা বাইরে বের করে দিন। এই প্রকার ৩ থেকে শুরু করে ২১ বার পর্যন্ত করতে পারেন।

বাহ্য প্রাণায়ামের সময় শিব সংকল্প :

এই প্রাণায়মেও কপালভাতির মত শ্বাসকে বাইরে ছুড়ে ফেলে সমস্ত বিকার, দোষগুলোকেও বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে... এই প্রকার মানসিক চিন্তন করা উচিত। বিচার-শক্তি যত বেশি প্রবল হবে, সমস্ত কষ্ট ততই প্রবলতার সঙ্গে দূর হয়ে পড়বে... এমনটা নিশ্চিত জানুন। মনের শিবসংকল্প যুক্ত হওয়াটা সকল প্রকারের ব্যাধির সংহারক এবং শীঘ্র সুফলদায়ক হয়।

লাভ :

এটা হচ্ছে এক ক্ষতিরহিত প্রাণায়াম। এতে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই প্রাণায়াম পেটের রোগে বিশেষ লাভপ্রদ হয়। বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রাণায়াম শরীরের শোধন করে। বীর্যকে ঊর্দ্ধগামী করে তুলে স্বপ্নদোষ, শীঘ্রপতন ইত্যাদি ধাতু-বিকারের নিবৃত্তি করে। বাহ্য প্রাণায়ামের অভ্যাস করলে পেটের সব অবয়বের ওপরে বিশেষ জোর পড়ে এবং শুরুতে পেটের দুর্বলতা বা রোগগ্রস্ত অংশে হাল্কা যন্ত্রণারও অনুভূতি হয়। সুতরাং, পেটকে বিশ্রাম এবং আরোগ্য প্রদান করার জন্য ত্রিবন্ধপূর্বক এই প্রাণায়াম করা উচিত।

চতুর্থ প্রক্রিয়া - অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম : নাসিকা বন্ধ করার বিধি :

ডান হাতকে তুলে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান দিকের স্বর *(পিঙ্গলা নাড়ি)* এবং অনামিকা বা মধ্যমা আঙুল দ্বারা বাঁ দিকের স্বর বন্ধ করা উচিত। হাতের পাতাকে নাকের সামনে না রেখে একটু ওপরে রাখা উচিত। *(দেখুন চিত্র ২ এবং ৩)*

বিধি ঃ

ইড়া নাড়ি *(বাঁ দিকের স্বর)* যেহেতু সোম, চন্দ্রশক্তি বা শান্তির প্রতীক হয়, সেজন্য নাড়ি শোধন করার জন্য অনুলোম-বিলোম প্রাণায়ামকে বাঁ দিকের নাসিকা দিয়ে শুরু করতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডান দিকের নাককে বন্ধ করে বাঁ দিকের নাম দিয়ে শ্বাস ধীরে-ধীরে ভেতরে ভরা উচিত। শ্বাস পুরো ভেতরে ভরে নেবার পর, অনামিকা বা মধ্যমা দিয়ে বাঁ দিকের স্বরকে বন্ধ করে ডান দিকের নামক দিয়ে শ্বাসকে পুরো বাইরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ধীরে-ধীরে শ্বাস-প্রঃশ্বাসের গতিকে প্রথমে মধ্যম এবং তারপর তীব্র করে তোলা উচিত। তীব্র গতিতে পুরো শক্তির সঙ্গে শ্বাস ভেতরে ভরুন এবং বাইরে বের করুন আর নিজের শক্তি অনুযায়ী শ্বাস-প্রঃশ্বাসের সঙ্গে গতি মৃদু, মধ্যম এবং তীব্র করুন। তীব্র গতিতে পূরক আর রেচক করলে প্রাণের তীব্র ধ্বনি হতে থাকে। শ্বাস পুরো বাইরে বেরিয়ে গেলে বাঁ দিকে স্বরকে বন্ধ রেকে ডান নাক দিয়ে শ্বাস পুরো ভেতরে ভরা উচিত এবং শ্বাস পুরো বাইরে ছাড়া উচিত। এটা এক প্রক্রিয়া পূর্ণ হল।

এই প্রকার এই বিধিকে সর্বদা করে চলুন অর্থাৎ বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে ড়ান নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়া, তারপর ডান নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে বাঁ নাক দিয়ে শ্বাসকে বাইরে ছাড়া। এই ক্রমকে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত করলে শরীরে ক্লান্তি অনুভব হতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে উঠলে মাঝখানে একটু বিশ্রাম করে, ক্লান্তি দূর হলে আবার প্রাণায়াম করুন। এই প্রকার ৩ মিনিট থেকে শুরু করে এই প্রাণায়ামকে ১০ মিনিট পর্যন্ত করে যেতে পারে। কিছুদিন এই প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাস করলে ব্যক্তির সামর্থ্য বেড়ে ওঠে এবং এক মাসের মধ্যে সাধক না থেমে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এই প্রাণায়াম করতে লাগেন। পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এর অভ্যাস প্রতিটি ব্যক্তির করা উচিত। এই প্রাণায়াম করার অধিকতম সময় হচ্ছে ১০ মিনিট। এর থেকে বেশি সময় পর্যন্ত এই প্রাণায়াম করলে মূলাধার চক্রে সন্নিহিত শক্তির জাগরণ হতে লাগে। একেই বেদে উর্দ্ধরেতস্ হওয়া আর আধুনিক যোগের ভাষায় কুণ্ডলিনী জাগরণ বলা হয়। এই প্রাণায়াম করার সময় প্রত্যেক শ্বাস-প্রঃশ্বাসের সঙ্গে মানসিক রূপে ওঁ-য়ের চিন্নত এবং মননও করে চলা উচিত। এমনটা করলে মন ধ্যানের উন্নত অবস্থার যোগ্য হয়ে ওঠে।

অনুলোম-বিলোম করার সময় শিবসংকল্প ঃ
এই প্রাণায়াম করার সময় মনে এমন বিচার করে আসুন যে, ইড়া এবং পিঙ্গলা নাড়িতে শ্বাসের ঘর্ষণ এবং মন্থন হওয়ায় সুষুম্না নাড়ি জাগ্রত হয়ে উঠছে। অষ্ট চক্র থেকে শুরু করে সহস্রার চক্র পর্যন্ত এক দিব্য জ্যোতির ঊর্দ্ধস্ফূরণ হচ্ছে।
আমার সম্পূর্ণ দেহ দিব্য আলোকে দেদীপ্তমান হয়ে উঠেছে। চিত্র ১৬ অনুযায়ী শরীরের বাইরে এবং ভেতরে দিব্য আলোক, জ্যোতি এবং শক্তির ধ্যান করতে করতে 'ওম্ খং ব্রহ্ম'-র সাক্ষাৎকার করুন। এমনটা চিন্তা করুন যে, বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের দিব্য-শক্তি, দিব্য জ্ঞানের বৃষ্টি চার পাশ থেকে হয়ে চলেছে। সেই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা নিজের দিব্য শক্তি দ্বারা আমাকে ওতপ্রোত করছেন। "শক্তিপাত"-এর দীক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করুন। শক্তির জন্য গুরুমাত্র প্রেরক হন, গুরু তো শুধুমাত্র দিব্য সংবেদনার সঙ্গে যুক্ত করেন। বাস্তবে শক্তির অসীম সিন্ধু ওম্কার পরমেশ্বর 'শক্তিপাত' করেন। এই প্রকার দিব্য সংবেদনা দ্বারা ওতপ্রোত হয়ে করা এই অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম দ্বারা বিশেষ শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক লাভ প্রাপ্ত হবে। মূলাধার চক্র থেকে স্বয়ং এক জ্যোতি স্ফূরিত হবে, কুণ্ডলিনী জাগরণ হবে, আপনি ঊর্দ্ধরেতা হয়ে উঠবেন এবং '*শক্তিপাত*'-এর দীক্ষায় আপনি নিজে থেকে দীক্ষিত হয়ে উঠবেন।

লাভ ঃ

১. এই প্রাণায়াম দ্বারা বাহাত্তর কোটি, বাহাত্তর লক্ষ, দশ হাজার দু শো দশ নাড়ি পরিশুদ্ধ হয়। সম্পূর্ণ নাড়িগুলোর শুদ্ধি হয়ে পড়ায় দেহ পূর্ণ সুস্থ, কান্তিময় এবং বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।
২. সন্ধিবাত, আমবাত, গেঁটে বাত, কম্পবাত, স্নায়ু দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্ত বাত রোগ, মূত্ররোগ, ধাতুরোগ, শত্রুক্ষয়, অম্লপিত্ত, শীতপিত্ত ইত্যাদি সমস্ত পিত্ত রোগ, সর্দ্দি-জ্বর, পুরোন শ্লেষ্মা, সাইনাস, হাঁফানী, কাশি, টনসিল ইত্যাদি সমস্ত কফ রোগ দূর হয়। ত্রিদোষ প্রশমন হয়।
৩. হৃদয়ের শিরাগুলোয় আসা অবরোধ *(ব্লকেজ)* খুলে যায়। এই প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাস করলে প্রায় তিন-চার মাসে তিরিশ শতাংশ থেকে শুরু করে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত অবরোধ *(ব্লকেজ)* খুলে যায়। এমন অভিজ্ঞতা আমরা বেশ কিছু রোগীর ওপরে প্রয়োগ করে অর্জন করেছি।

৪. কোলেষ্ট্রল, ট্রাইগ্লিস্রাইডস্, এইচ.ডি.এল. বা এল.ডি.এল. ইত্যাদির অনিয়মিততাও দূর হয়ে পড়ে।

৫. নকারাত্মক চিন্তায় পরিবর্তন এসে সকারাত্মক বিচার বাড়তে থাকে। আনন্দ, উৎসাহ এবং নির্ভয়তার প্রাপ্তি হতে থাকে।

৬. সংক্ষেপে আমরা এটাই বলতে পারি যে, এই প্রাণায়াম দ্বারা শরীর, মন, বিচার এবং সংস্কার... সব কিছুই পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত রোগ নষ্ট হয়ে পড়ে এবং মন পরিশুদ্ধ হয়ে ওম্কারের ধ্যানে লীন হয়ে পড়ে। এই প্রাণায়াম ২৫০ থেকে ৫০০ বার পর্যন্ত করলে মূলাধার চক্রে সন্নিহিত কুণ্ডলিনী শক্তি, যা অধোমুখ থাকে, সেটা উর্দ্ধমুখ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে পড়ে।

নোট ঃ আরও বেশি তথ্য এবং সতর্কতার ব্যাপারে জানার জন্য কুণ্ডলিনী জাগরণের উপায় এবং সতর্কতা প্রকরণ দেখুন।

৫. পঞ্চম প্রক্রিয়া — ভ্রামরী প্রাণায়াম ঃ

শ্বাস পুরো ভিতরে পুরে মধ্যমা আঙুল দিয়ে নাসিকার মূলে চোখের পাশটা দু পাশ থেকে একটু চাপুন, মনকে আজ্ঞা চক্রে কেন্দ্রিত রাখুন। দু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুটো কান পুরো বন্ধ করে নিন (দেখুন চিত্র ৪)। এবার ভ্রমরের মত গুঞ্জন করতে-করতে নাদ রূপে ওঁ-য়ের উচ্চারণ করতে-করতে শ্বাস বাইরে ছেড়ে দিন। আবার এই প্রকারের পুনরাবৃত্তি করুন। এইভাবে এই প্রাণায়াম কম পক্ষে তিন বার অতি অবশ্যই করুন। এই প্রাণায়াম ১১ থেকে ২১ বার পর্যন্ত করা যেতে পারে।

ভ্রামরী প্রাণায়ামের সময় শিবসংকল্প ঃ

এই প্রাণায়াম নিজের চেতনাকে ব্রাহ্মী চেতনা, ঈশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে তন্ময় এবং তদ্রূপ করতে-করতে করা উচিত। মনে এমনটা দিব্য সংকল্প বা বিচার নিয়ে আসা উচিত যে, আমার ওপরে ভগবানের করুণা, শান্তি এবং আনন্দের বৃষ্টি হচ্ছে। আমার আজ্ঞা চক্রে ভগবান দিব্য জ্যোতির রূপে প্রকট হয়ে আমার সমস্ত অজ্ঞানতাকে দূর করে আমাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাসম্পন্ন বানাচ্ছেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভাবযুক্ত হয়ে এই প্রাণায়াম করলে এক দিব্য জ্যোতির্পুঞ্জে আজ্ঞা চক্রে প্রকট হয় এবং ধ্যান আপনা থেকেই লাগতে থাকে।

লাভ ঃ

এই প্রাণায়াম করলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। মানসিক টেনশন, উত্তেজনা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ইত্যাদিতে এই প্রাণায়াম অত্যন্ত লাভপ্রদ হয়। এটা ধ্যানের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী প্রাণায়াম।

৬. ষষ্ঠ প্রক্রিয়া — ওম্‌কার জপ ঃ

পূর্বনির্দিষ্ট সব প্রাণায়াম করার পর শ্বাস-প্রঃশ্বাসের ওপরে নিজের মনকে টিকিয়ে প্রাণের সাথে উদ্‌গীথ 'ওঁ'-য়ের ধ্যান করুন। ভগবান ভ্রূয়ের আকৃতি ওম্‌কারময়ী বানিয়েছেন। এই পিণ্ড (= দেহঃ এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ওম্‌কারময়। 'ওম্‌কার' কোন ব্যক্তি বা আকৃতি বিশেষ নয়, সেটা হচ্ছে এক দিব্য শক্তি, যা এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালন করছে। দ্রষ্টা হয়ে দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম গতিতে শ্বাস নেওয়া আর ছাড়ার সময় শ্বাসের গতি এত সূক্ষ্ম হওয়া উচিত যে, নিজেরও যেন শ্বাসের অনুভূতি না হয় এবং যদি নাকের সামনে তুলোও রাখা হয়, তাহলে সেটাও যেন না নড়ে। ধীরে-ধীরে অভ্যাস বাড়িয়ে এমন চেষ্টা করুন যে, এক মিনিটে যেন একবার শ্বাস এবং একবার প্রঃশ্বাস চলে। এই প্রকার শ্বাসকে ভেতর পর্যন্ত দেখারও চেষ্টা করুন। শুরুতে শ্বাসের স্পর্শের অনুভূতি শুধুমাত্র নাসিকার অগ্রভাগে হবে। ধীরে-ধীরে শ্বাসের গভীর স্পর্শকেও আপনি অনুভব করতে পারবেন। এই প্রকার কিছু সময় পর্যন্ত শ্বাসের সঙ্গে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষীভাবপূর্বক 'ওম্‌কার' জপ করতে থাকলে ধ্যান আপনা থেকে লাগতে থাকবে। আপনার মন অত্যন্ত একাগ্র এবং ওম্‌কারতে তন্ময় এবং তদ্‌রূপ হয়ে উঠবে। প্রণবের সাথে-সাথে বেদের মহান মন্ত্র গায়ত্রীরও অর্থপূর্বক জপ এবং ধ্যান করা যেতে পারে। এই প্রকার সাধক ধ্যান করতে-করতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপে তদ্‌রূপ হয়ে উঠে সমাধির অনুপম দিব্য আনন্দকেও প্রাপ্ত করতে পারে। ঘুমোবার সময় এই প্রকার ধ্যান করতে-করতে ঘুমোন উচিত, এমনটা করলে নিদ্রাও যোগময়ী হয়ে উঠবে, দুঃস্বপ্ন থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে এবং নিদ্রা শীঘ্র আসবে আর প্রগাঢ় থাকবে।

৭. সপ্তম প্রক্রিয়া — নাড়ি শোধন প্রাণায়াম ঃ

শুরুতে নাড়ি শোধন প্রাণায়ামের জন্য অনুলোম-বিলোমর মত ডান নাককে বন্ধ করে বাঁ নাক দিয়ে শ্বাসকে অত্যন্ত দ্রুত ভেতরে ভরা উচিত। পুরো শ্বাস ভেতরে ভরার পরে প্রাণকে যথাশক্তি ভেতরেই আটকে রেখে মূলবন্ধ এবং জালন্ধর বন্ধ লাগানো উচিত। তারপর জালন্ধর বন্ধ সরিয়ে

শ্বাসকে অত্যন্ত ধীর গতিতে ডান নাক দিয়ে বাইরে ছাড়া উচিত। পুরো শ্বাস বেরিয়ে যাবার পরে ডান দিকের স্বর দ্বারা শ্বাসকে ধীরে-ধীরে ভেতরে পুরে অন্তঃকুম্ভক করুন, যথাশক্তি ভেতরেই প্রাণকে আটকে রাখার পরে বাঁ দিকের স্বর দ্বারা শ্বাসকে ধীরে-ধীরে বাইরে বের করে দিন। এটা এক চক্র বা নাড়ি শোধন প্রাণায়ামের এক অভ্যাস পূর্ণ হল। এই প্রক্রিয়াকে নাকের ওপর হাত না লাগিয়ে মানসিক একাগ্রতার সঙ্গে করতে পারলে আরও বেশি লাভ প্রাপ্ত করা যেতে পারে, কারণ এতে মনকে পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে প্রাণের ওপরে কেন্দ্রিত রাখা যায় এবং মনও অত্যন্ত স্থিরতা প্রাপ্ত করে। শ্বাস নেবার আর ছাড়ার সময় প্রাণের কোন শব্দ হওয়া উচিত নয়। এই প্রাণায়াম একবার থেকে শুরু করে কমপক্ষে তিনবার পর্যন্ত অতি অবশ্যই করা উচিত। এর থেকে বেশিবার করার ইচ্ছে হলে যতবার ইচ্ছে করতে পারেন। নাড়ি শোধন প্রাণায়ামে পূরক, অন্তঃকুম্ভক এবং রেচকের পরিমাণ শুরুতে যথাশক্তি ১:২:২ রাখা উচিত অর্থাৎ আপনি যদি ১০ সেকেন্ড পূরক করেন তো ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত অন্তঃকুম্ভক করা উচিত এবং ২০ সেকেন্ডই ধীরে-ধীরে রেচক করা উচিত। পরে, এর অনুপাত ১:৪:২ পর্যন্ত রাখুন। এতটা হবার পর এর সাথে বাহ্যকুম্ভকও যুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ ১:৪:২:২-য়ের অনুপাতে ক্রমশঃ পূরক, অন্তঃকুম্ভক, রেচক এবং বাহ্যকুম্ভক করা উচিত।

এই প্রাণায়ামকে অত্যন্ত ধীরে গীততে করা উচিত। সংখ্যার চক্করে না পড়ে যথাশক্তি সহজভাবে এই প্রাণায়ামকে করলে প্রাণের গতি যত দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হবে, তত বেশি লাভ প্রাপ্ত হবে। যথাশক্তি শ্বাস নেওয়া, ছাড়াও আটকে রাখাই হচ্ছে এই প্রাণায়ামের বাস্তবিক পরিমান। এমনটা করলে মাঝখানে বিশ্রাম নেবার আবশ্যকতাই পড়বে না। পূরক, কুম্ভক এবং রেচক করতে-করতে ওঁ বা গায়ত্রীর মানসিক রূপে জপ, চিন্তন এবং মননও করে চলা উচিত।

লাভ ঃ

এই প্রাণায়ামের সব লাভ অনুলোগ-বিলোম প্রাণায়ামেরই সমান।

রোগোপচারের দৃষ্টিতে উপযোগী অন্য প্রাণায়াম

১. সূর্যভেদী বা সূর্যাঙ্গ প্রাণায়াম ঃ

ধ্যানাসনে বসে ডান নাক দিয়ে পূরক করার পর কুম্ভক জালন্ধর এবং মূলবন্ধের সাথে করুন এবং শেষে বাঁ নাক দিয়ে রেচক করুন। অন্তঃকুম্ভকের সময় ধীরে-ধীরে বাড়ানো উচিত। এই প্রাণায়ামের আবৃত্তি ৩,৫ বা ৭... এই ভাবে বাড়িয়ে কিছু দিনের অভ্যাসের পর ১০ পর্যন্ত বাড়ান। কুম্ভকের সময় তেজের সঙ্গে সূর্যমন্ডলের ধ্যান করা উচিত। গ্রীষ্ম ঋতুতে এই প্রাণায়মের অভ্যাস অল্প মাত্রায় করা উচিত।

লাভ ঃ

শীরের উষ্ণতা এবং পিত্তের বৃদ্ধি করে। বাত এবং কফ থেকে উৎপন্ন হওয়া রোগ, রক্ত এব ত্বকের দোষ, উদর-কৃমি, কুষ্ঠ, গনোরিয়া, সংক্রামক রোগ, অজীর্ণ, অপচন, স্ত্রী-রোগ ইত্যাদিতে এই প্রাণায়াম লাভদায়ক হয়। কুণ্ডলিনী জাগরণে সহায়ক হয়। বার্ধক্য দূর করে। অনুলোম-বিলোমের পরে অল্প মাত্রায় এই প্রাণায়াম করা উচিত। কুম্ভক ছাড়া সূর্যভেদী প্রাণায়াম করলে হৃদয় গতি এবং শরীরের কার্যশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের ওজন কমে। এর জন্য এর ২৭ চক্র দিনে ২ বার করাটা অত্যন্ত জরুরী।

২. চন্দ্রভেদী বা চন্দ্রাঙ্গ প্রাণায়াম ঃ

এই প্রাণায়ামে বাঁ নাক দিয়ে পূরক করে, অন্তঃকুম্ভক করুন। একে জালন্ধর এবং মূলবন্ধের সাথে করাটা উত্তম। তারপরে ডান নাক দিয়ে রেচক করুন। এই প্রাণায়ামে সর্বদা চন্দ্রস্বর দিয়ে পূরক এবং সূর্যস্বর দিয়ে রেচক করা হয়। সূর্যভেদী এর ঠিক বিপরীত। কুম্ভকের সময় পূর্ণ চন্দ্রমন্ডলের প্রকাশের সঙ্গে ধ্যান করুন। শীতকালে এই প্রাণায়ামের অভ্যাস কম মাত্রায় করা উচিত।

লাভ ঃ

শরীরে শীতলতা এসে ক্লান্তি এবং উষ্ণতা দুর হয়। মানসিক উত্তেজনা

শান্ত হয়। পিত্তের কারণে উৎপন্ন জ্বলুনিতে এই প্রাণায়াম লাভদায়ক হয়।

৩. উজ্জায়ী প্রাণায়াম ঃ

এই প্রাণায়ামে পূরক করতে-করতে গলাকে সংকুচন করতে হয় এবং যখন গলাকে সংকুচিত করে শ্বাস ভেতরে ভরা হয়, তখন গলা দিয়ে নাক ডাকার মত আওয়াজ বেরোতে থাকে... এমনিতেও এই প্রাণায়ামে পূরক করার সময় গলা দিয়ে আওয়াজ হতে থাকে। ধ্যানাত্মক আসনে বসে দুই নাক দিয়ে শ্বাস ভেতরে টেনে নিন। গলাকে একটু সঙ্কুচিত করলে গলায় শ্বাসের পর্শ অনুভূত হবে। হাওয়ার ঘর্ষণ নাকে হওয়াটা উচিত নয়। গলায় ঘর্ষণ হলে এক ধ্বনি উৎপন্ন হবে। শুরুতে কুম্ভকের প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র পূরক-রেচকেরই অভ্যাস করা উচিত। পূরকের পর ধীরে-ধীরে কুম্ভকের সময় পূরকের মত এবং কিছুদিন অভ্যাস করার পর কুম্ভকের সময় পূরকের দ্বিগুণ করে দিন। কুম্ভক ১০ সেকেন্ডের বেশি করতে হলে জালন্ধর বন্ধ এবং মূলবন্ধও লাগান। এই প্রাণায়ামে সর্বদা ডান নাককে বন্ধ রেখে বাঁ নাক দিয়েই রেচক করা উচিত।

লাভ ঃ

যেসব ব্যক্তি পুরো বছরই সর্দি-কাশি-জ্বরে পীড়িত হয়ে থাকেন, যাঁদের টনসিল, থায়রডেয় গ্ল্যান্ড, অনিদ্রা, মানসিক টেনশন এবং রক্তচাপ, অজীর্ণ, আমবাত, জলোদর, টি.বি., জ্বর, প্লীহা ইত্যাদি রোগ আছে, তাঁদের জন্য এই প্রাণায়াম অত্যন্ত লাভপ্রদ। গলাকে নিরোগী এবং মধুর বানাবার জন্য এই প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত। কুণ্ডলিনী জাগরণ, অজপা-জপ ধ্যান ইত্যাদির জন্য এটা এক উত্তম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের অভ্যাসে বাচ্চাদের তোতলানোও ঠিক হয়ে পড়ে।

৪. কর্ণ রোগান্তক প্রাণায়াম ঃ

এই প্রাণায়ামে দুই নাক দিয়ে পূরক করে তারপর মুখ আর দুই নাক বন্ধ করে পূরক করা শ্বাসকে বাইরের দিকে ধাক্কা দেওয়া হয়, যেমনটা শ্বাসকে কান দিয়ে বাইরে বের করার চেষ্টা করা হয়। ৪-৫ বার শ্বাসকে ওপরের দিকে ধাক্কা দিয়ে তারপর দুই নাক দিয়ে রেচক করুন। এই

প্রকার ২-৩ বার করাটাই পর্যাপ্ত হবে।

লাভ ঃ

কানের রোগে এবং কানে কম শোনা রোগে এই প্রাণায়াম লাভ প্রদান করে।

৫. শীতলী প্রাণায়াম ঃ

ধ্যানাত্মক আসনে বসে দুটো হাত হাঁটুর ওপরে রাখুন। জিভকে নালির মত সরু করে মুড়ে মুখ খোলা রেখে মুখ দিয়ে পূরক করুন। জিভ দিয়ে ধীরে-ধীরে শ্বাস নিয়ে ফুসফুসে পুরো ভরে নিন। কয়েক মুহূর্ত থেমে মুখ বন্ধ করে দুই নাক দিয়ে রেচক করুন। তারপরে আবার একবার জিভকে মুড়ে মুখ দিয়ে পূরক এবং নাক দিয়ে রেচক করুন। এই ভাবে ৪ থেকে ১০ বার করুন। শীতকালে এই প্রাণায়ামে অভ্যাস কম মাত্রায় করুন।

দ্রষ্টব্য ঃ কুম্ভকের সাথে জালন্ধর বন্ধও লাগাতে পারে। কফ প্রকৃতির ব্যক্তি এবং টনসিলের রোগীদের শীতলী এবং সীৎকারী প্রাণায়াম করা উচিত নয়।

লাভ ঃ

১. জিভ, মুখ এবং গলার রোগে এই প্রাণায়াম অত্যন্ত লাভপ্রদ হয়। গুল্ম, প্লীহা, জ্বর, অজীর্ণ ইত্যাদি ঠিক হয়ে পড়ে।
২. এই প্রাণায়ামের সিদ্ধিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার ওপরে বিজয় প্রাপ্ত হয়, এমনটা যোগ গ্রন্থগুলোয় বলা হয়েছে।
৩. উচ্চ রক্তচাপকে এই প্রাণায়াম ঠিক করে। পিত্তের রোগে এই প্রাণায়াম লাভ প্রদান করে। এই প্রাণায়াম রক্তশোধনও করে।

৬. সীৎকারী প্রাণায়াম ঃ

ধ্যানাত্মক আসনে বসে জিভকে ওপরের দিকে তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ওপর আর নীচের পাটির দাঁতের সঙ্গে একদম সাঁটিয়ে ধরে ঠোঁটকে খুলে রাখুন। এবার ধীরে-ধীরে 'সী-সী' আওয়াজ করতে-করতে মুখ দিয়ে শ্বাস নিন এবং ফুসফুসে পুরো শ্বাস ভরে নিন। জালন্ধর বন্ধ লাগিয়ে যতক্ষণ বিশ্রাম করতে পারেন, করুন। তারপর মুখ বন্ধ করে নাক

দিয়ে ধীরে-ধীরে রেচক করুন। আবার একবার এই জিনিসটার পুনরাবৃত্তি করুন। এমনটা ৮-১০ বার অভ্যাস করলেই যথেষ্ট হবে। শীতকালে এই প্রাণায়ামের অভ্যাস কম মাত্রায় করা উচিত।

দ্রষ্টব্য ঃ

১. আপনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস কুম্ভক এবং জালন্ধর বন্ধ ছাড়াও করতে পারেন।

২. পূরক করার সময় দাঁত এবং জিভ নিজের জায়গায় স্থির থাকা উচিত।

লাভ ঃ

১. এই প্রাণায়ামের গুণ-ধর্ম এবং লাভ শীতলী প্রাণায়ামেরই মত।

২. পায়োরিয়া ইত্যাদি দন্তরোগ, গলা, মুখ, নাক, জিভ ইত্যাদির রোগ এই প্রাণায়ামে দূর হয়ে পড়ে।

৩. ঘুম কম হয় এবং শরীর ঠান্ডা থাকে।

৪. উচ্চ রক্তচাপে ৫০ থেকে ৬০ বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করলে ভালো লাভ পাওয়া যায়।

৭. মূর্চ্ছা প্রাণায়াম ঃ

এই প্রাণায়ামে চোখ বন্ধ করে দুই নাক দিয়ে পূরক, করতে-করতে মাথাকে ওপরে উঠিয়ে পেছন দিকে নিয়ে যেতে হয়, যাতে দৃষ্টি আকাশের দিকে থাকে। তারপর অন্তঃকুম্ভক লাগাতে হয়। পরে চোখ খুলে আকাশের দিকে তাকাতে হয়। অন্তঃকুম্ভকের পরে চোখ বন্ধ করে মাথাকে আগের অবস্থায় এনে ধীরে-ধীরে রেচক করতে হয়। আর বিশ্রাম না নিয়ে পূরক, আকাশ দৃষ্টি, কুম্ভক...সব কিছু এক সঙ্গে করতে হয় এবং আগের অবস্থায় ফিরে আসতে হয়। প্রতিদিন ৫ বার করাটাই যথেষ্ট।

লাভ ঃ

মাথা যন্ত্রণা, আধকপালী, বাত কম্প, স্নায়ু দৌর্বল্য ইত্যাদিতে ভালো লাভ পাওয়া যায়। চোখের জ্যোতি বাড়া এবং স্মরণশক্তি তীব্র করতেও উপযোগী। এই প্রাণায়াম কুণ্ডলিনী জাগ্রত করতে এবং মনকে অন্তর্মুখী করে তুলে ধ্যান লাগাতে সহযোগ করে।

৮. প্লাবিনী প্রাণায়াম

এটা হচ্ছে এক প্রকারের বায়ু ধৌতি। মুখ দিয়ে যেমন জল পান কার হয়, ঠিক তেমনই বায়ুও... যতক্ষণ না পুরো পেট বায়ুতে ভরে যাচ্ছে, লাগাতার পান করে চলুন। তারপর এমন ভাবে ঢেঁকুর তুলন, যাতে পান করা সমস্ত বায়ু তৎক্ষণাত পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই প্রাণায়ামে বায়ু পান করে দূষিত বায়ুকে মুখ দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

লাভ ঃ

পেটের সমস্ত প্রকারের রোগ এবং হিষ্টিরিয়া দূর করতে এই প্রাণায়াম সহযোগ করে। কৃমির নাশ করে এবং জঠরাগ্নিকেও প্রদীপ্ত করে তোলে। এই প্রাণায়ামে দূষিত বায়ু বেরিয়ে যায়।

৯. কেবলী প্রাণায়াম ঃ

এতে শুধুমাত্র পূরক-রেচক করা হয়। কুম্ভক করা হয় না। পূরকের সাথে 'ও' শব্দের এবং রেচকের সাথে 'ম্' শব্দের মানসিক উচ্চারণ করা হয়। এই ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে 'ওম্'-য়ের উদগীথের রূপে মানসিক অজপা-জপ নিরন্তর হয়ে চলে।

লাভ ঃ

শীঘ্র একাগ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং অজপা-জপ সিদ্ধ হয়।

শরীরে সন্নিহিত শক্তি-কেন্দ্র বা চক্র

চক্র হচ্ছে আমাদের শরীরে সন্নিহিত বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভুত শক্তির কেন্দ্র। এই সমস্ত চক্র মেরুদণ্ডের মূল থেকে শুরু করে তার ওপরে অংশ পর্যন্ত জুড়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় এই সব চক্র না ফোটা পদ্ম ফুলের মত অধোমুখ হয়ে অবিকশিত অ বস্থায় থাকে। ব্রহ্মচর্য পালন, প্রাণায়াম এবং ধ্যান ইত্যাদি যৌগিক বিধি দ্বারা উত্তেজিত হয়ে যখন এগুলো উর্দ্ধমুখ হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন তাদের অলৌকিক শক্তিগুলোর বিকাশ হয়। চিত্র দ্বারা দেখানো চক্রগুলোর স্থূল আকৃতি তাদের সূক্ষ্ম স্বরূপের বোধ করানোর জন্য শুধুমাত্র প্রতীকাত্মক হয়। এই প্রকার Plevic Plexus ইত্যাদি ইংরাজী নামও তাদের বাস্তবিক স্থানগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে মাত্র।

চক্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

চক্রের সম্বন্ধে অথর্ববেদে বলা হয়েছে ঃ

অষ্টচক্রা নব দ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যয়: কোশ: স্বর্গো জ্যোতিষাবৃত:।।

(অথর্ববেদ)

দেবতাদের নগরী এই অযোধ্যারূপী দেহে অষ্ট চক্র এবং নয় দ্বার *(দুই চোখ, দুই নাক, দুই কান, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ)* রয়েছে। এই নগরীতে এক দেদীপ্তমান হিরণ্যকোষ রয়েছে, যা অনন্ত, অপরিমিত, অসীম সুখ-শান্তি, আনন্দ এবং দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। একমাত্র যোগাভ্যাসী উপাসক সাধকই এই দিব্য কোষ *(ভাণ্ডার)*-কে প্রাপ্ত করতে পারেন। এবার আমরা সংক্ষেপে চক্রের সম্বন্ধে বর্ণনা করছি।

১. মূলাধার চক্র (Pelvic Plexus) :

এই চক্র পায়ুমূল থেকে দু আঙুল ওপরে এবং উপস্থমূল থেকে দু আঙুল নীচে অবস্থিত। এর মাঝখান থেকে সুষুম্না *(সরস্বতী)* নাড়ি এবং বাঁ কোণ থেকে ইড়া *(গঙ্গা)* নাড়ি বেরিয়েছে। এজন্য একে মুক্ত ত্রিবেণীও বলা হয়। মূলশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তির আধার হওয়ায় একে মূলাধার

চক্র বলা হয়। এই চক্রের ওপরে ধ্যান করলে আরোগ্যতা, দক্ষতা এবং কর্ম-কুশলতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ হয়। এই চক্র জাগ্রত হলে পুরুষ ঊর্দ্ধতো, তেজস্বী এবং কান্তিময় হয়ে ওঠে এবং শরীরের সমস্ত ব্যাধি নষ্ট হয়ে পড়ে।

চিত্র ৫ প্রদর্শন করছে যে, এই প্রথম চক্র মূলাধারের সবিতা *'বুদ্ধির তেজদ্বারা প্রেরিত 'মানস-রশ্মি'* প্রকাশিত করছে। এই স্থানে ফোয়ারা বা টর্চের মৃদু জ্যোতির মত বেরোতে থাকা প্রকাশ, সেই তন্তু থেকে বেরোচ্ছে, যেটা স্বাধিষ্ঠান চক্রের সামনে থেকে শুরু করে মূলাধার পর্যন্ত চলে গেছে। এখানে নিবিড় অন্ধকার শেকড় গেড়ে থাকে। প্রাণ-সাধনা এবং ধারণা-ধ্যান দ্বারা এই অন্ধকারকে সরিয়ে 'মূলাধার'-কে প্রকাশিত করা হয়। এই প্রকাশ মূলাধারগত সমগ্র স্থূলতা এবং সূক্ষ্মতার দর্শন করায়। একে *'কুণ্ডলিনী জাগরণ'*-ও বলা হয়। চিত্রে সংখ্যা (১) সুষুম্না শিখর, (২) উদরের নিম্ন ভাগ এই চক্রের সঙ্গে সম্বন্ধিত, (৩) গোলাপী রং-য়ের ছোট অন্ত্র, (৪) হলুদ রং-য়ের বড় অন্ত্র, (৫) বড় অন্ত্রের নীচের অংশে *'পায়ু মন্ডল' (মলাশয় এবং পায়ুদ্বার)*, ৬. পুচ্ছাস্থি *(মেরুদণ্ডের নীচের অংশ)*, ৭. সুষুম্নার নিম্নদ্বার, (৮) সুষুম্নার নীচের অংশ সৌষুম্ন — মুখ্য তন্তু, (৯) সমস্ত মূলাধার মন্ডল প্রকাশিত হওয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

২. স্বাধিষ্ঠান চক্র (Hypogastric Plexus)

মূলাধার চক্রের দু আঙুল ওপরে কোমারের কাছে এই চক্রের স্থান। তন্ত্র গ্রন্থগুলোতে এই চক্রে ধ্যান করার ফল সৃজন, পালন এবং নিধনে সমর্থতা আর জিভে সরস্বতী হওয়া বলা হয়েছে।

চিত্র ৬ থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্বাধিষ্ঠান চক্র কোমরে অবস্থিত। এই চক্রে মূত্র-সংস্থান রয়েছে, যাতে (১) ডান-বাঁ কিডনী, (২) মূত্রাশয়, (৩) মূত্রেন্দ্রিয়ের পেছনের অংশ, (৪) কিড়নী থেকে বের হওয়া *'মূত্রবাহ'* নলি, যা মূত্রাশয় (২)-তে গিয়ে মেশে। এই চক্রে দ্বিতীয় *'শুক্র সংস্থান'*-ও সম্মিলিত রয়েছে, যাতে সবুজ-পত্র (৫) *'শুক্রকোষ'* রয়েছে, *'শুক্রবাহিনী নলি'* ডান দিকে-বাঁ দিকে রয়েছে, শুক্র তৈরী করার যন্ত্র (৬) অণ্ডকোষ, (৭) প্রোস্টেট গ্রন্থি রয়েছে, যার ভেতর দিয়ে শুক্রবাহী

এবং মূত্রবাহিনী নলি যায়, শুক্র এবং মূত্রনিকাশী পথ (৮) লিঙ্গ রয়েছে। এই চক্রের সাক্ষাৎকার হলে *'মুত্রসংস্থান'* এবং *'শত্রুসংস্থান'*-য়ের জ্ঞান এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞানও হয়ে পড়ে।

৩. মণিপুর চক্র (Epigastric Plexus or Solar Plesus) :

এর স্থান নাভিমূলে। যকৃৎ এবং অন্ত্র ইত্যাদি সম্পূর্ণ পাচন তন্ত্র এবং অগ্নাশয় ইত্যাদিকে এই চক্র শক্তি প্রদান করে। যোগদর্শনে 'নাভিচক্রে কায়ব্যুহজ্ঞানম্' (৩.২৯) সূত্র দ্বারা নাভিচক্রে ধ্যান করলে শরীর ব্যুহজ্ঞান অর্থাৎ শরীরের অবয়বগুলোর সন্নিবেশের জ্ঞান হয় বলে জানানো হয়েছে। এই চক্র জাগ্রত হয়ে উঠলে ডায়াবেটিজ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অপচন, গ্যাসইত্যাদি সমস্ত পাচন সংক্রান্ত বিকৃতি দূর হয়ে পড়ে।

চিত্র ৭ মণিপুর চক্রের প্রকাশ করছে। এটা নাভির পেছনে অবস্থিত। এই চক্রে (১) আমাশয়, (২) যকৃৎ, (৩) প্লীহা, (৪) প্যানক্রিয়াজ, (৫) পক্কাশয় সম্মিলিত রয়েছে।

৪. অনাহত চক্র (cardiac Plexus) :

এই চক্র হৃদয়ের কাছে বিদ্যমান। তন্ত্র গ্রন্থগুলোতে বাকপটুত্ব, কবিত্ব শক্তির লাভ এবং জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদিকে এর লাভ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিবাসর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই স্থানে উৎপন্ন হওয়া অনাহত ধ্বনি *(নাদ)*-ই সদাশিব *(কল্যাণ)* কারক উদগীথ রূপ ওম্‌কার। স্ত্রীলোক এবং শ্রদ্ধাপ্রধান চিত্তের সাধকদের জন্য এই চক্র হচ্ছে ধারণা এবং ধ্যানের জন্য উপযুক্ত স্থান। এই চক্রের ওপরে ধ্যান করতে থাকা ব্যক্তির কখনো হৃদয় রোগ হয় না।

চিত্র ৪ হচ্ছে অনাহত চক্রের বৃহৎ রূপ। এতে হৃদয় পুণ্ডরীকের মধ্যবর্তী মন্ডলগুলোকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

৫. হৃদয় চক্র বা নিম্ন মনশ্চক্র (Lower mind Plexus) :

এই চক্র দুই স্তনের মধ্যে বিদ্যমান। এই চক্রের ওপরে ধ্যান করলে দিব্য প্রেম, করুণা, সেবা এবং সহানুভূতি ইত্যাদি দিব্য গুণের বিকাশ হয়। মহর্ষি ব্যাস-ও হৃদয় চক্রে ধ্যান করার জন্য বলেন। এই হৃদয় শরীরের স্থূল ভাগ নয়, এটা হচ্ছে ভাবনাত্মক, যার সম্পর্ক ব্যক্তির চিত্ত বা মনের সঙ্গে রয়েছে। চিত্র ৯ দেখুন।

৬. বিশুদ্ধি চক্র (Carotid Plexus) :

এই চক্রের স্থান কণ্ঠে। এই চক্রের ওপরে ধ্যান করলে এবং এই চক্র জাগ্রত হয়ে উঠলে ব্যক্তি কবি, মহাজ্ঞানী, শান্তচিত্ত, নীরোগ, শোকহীন এবং দীর্ঘজীবি হয়ে ওঠে। থায়রয়েড গ্রন্থির রোগও এই চক্র জাগ্রত হয়ে উঠলে দূর হয়। চিত্র ১০ বিশুদ্ধি চক্রের বর্ণনা করছে, যার 'ক' ভাগে প্রদর্শিত সংখ্যাগুলোর সঙ্গে শ্বাস নলি (১), দুই ফুসফুস (২) এবং (৩) এবং ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ ভাগ (৪)-য়ের সম্পর্ক রয়েছে।

৭. আজ্ঞা চক্র (Madula Plexus) :

এই চক্র দুই ভ্রূয়ের মাঝে ভ্রূকুটির মধ্যে অবস্থিত। এই চক্রের সঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি পীযূষ গ্রন্থি এবং পিনীয়াল গ্রন্থির সম্পর্ক রয়েছে। আজ্ঞা চক্র সক্রিয় বা জাগ্রত হয়ে উঠলে এই দুটো গ্রন্থিরই কার্য্য ক্ষমতা অত্যন্ত বিকশিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তি অত্যন্ত কুশাগ্রবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কপালভাতি, অনুলোম-বিলোম এবং নাড়ি শোধন ইত্যাদি প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ এবং মন স্থির হয়ে পড়ার পর সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হতে লাগে। মূলাধার চক্র থেকে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুন্না পৃথক-পৃথক উর্দ্ধ প্রবাহিত হয়ে এই স্থানে সঙ্গম প্রাপ্ত করে। এজন্য আজ্ঞা চক্র স্থানকে ত্রিবেণী-ও বলা হয়। চিত্র ১০-য়ের 'খ' ভাগে ভ্রূমধ্যে দুটো গোলাকার *'আজ্ঞা চক্র'*-র স্থান, কপালে ভরা উর্দ্ধগামী প্রকাশ হচ্ছে *'সুষুন্না'*-র।

इडा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी।
तयोर्मध्यगता नाडी सुषुम्णाख्या सरस्वती।।
त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते।
तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते।।

(ज्ञान संकलिनी तन्त्र)

ইড়াকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং দুটোর মাঝখানে দিয়ে যাওয়া নাড়ি সযুন্নাকে সরস্বতী বলা হয়। এই ত্রিবেণীর যেখানে সঙ্গম হয়, সেই জায়গাকে তীর্থরাজ বলা হয়। এখানে স্নান করে সাধক সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পড়েন। এই ত্রিবেণী সঙ্গম বাইরে নয়, আমাদের ভেতরেই রয়েছে। *'বাইরের ত্রিবেণীতে স্নান করলে ব্যক্তি পাপমুক্ত হয়ে*

পড়ে' এটা হচ্ছে ভ্রান্তি, মিথ্যা জ্ঞান... কারণ এমনটা যদি সত্যিই হতে লাগে, তাহলে কোন ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, গুরু বা ভাই ইত্যাদিকে হত্যা করেও ত্রিবেণী সঙ্গমে করলে সে পাপমুক্ত হয়ে পড়তে পারে... কিন্তু এমনটা কখনো হয় না। পাপের অর্থই হচ্ছে *'অপরাধ'*, যার দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয়। সুতরাং পাপের ফল তো ভোগ করতেই হবে। পাপ করে আপনি যদি প্রায়শ্চিত্ত রূপ পূণ্য কর্মও করেন, তাহলেও পাপের ফল দুঃখের রূপে এবং পুণ্যের ফল সুখের রূপে আলাদা-আলাদা ভোগের রূপে আপনিপ্রাপ্তকরবেন। এজন্য, শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্"। হ্যাঁ, যদি শ্রদ্ধাপূর্বক কোন ব্যক্তি গঙ্গা বা ত্রিবেণীতে স্নান করে আর স্নান করার পরে এমন সংকল্প করে যে, সে জীবনে আর কখনো কোন পাপ কর্ম করবে না, তাহলে সেই ব্যক্তি নিজের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প দ্বারা ভবিষ্যতে পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু, তার দ্বারা তখনও পর্যন্ত করা পাপের হাত থেকে সেই ব্যক্তি বাঁচতে পারে না। এ তো গেল বাহ্য ত্রিবেণীর কথা, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রাণায়াম এবং ধ্যান দ্বারা আজ্ঞা চক্রে সন্নিহিত ত্রিবেণী সঙ্গমে মন স্থির করে ভগবানের ভক্তিতে, জ্ঞানের গঙ্গায় স্নান করে, তাহলে সেই ব্যক্তির ভেতর থেকে পাপ কর্ম করার ইচ্ছেই সমাপ্ত হয়ে পড়ে... পাপ কর্ম করা তো দূরের ব্যাপার। এজন্য যদি আমরা সত্যি-সত্যি পাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাহলে প্রতি দিন আজ্ঞা চক্রে মনের নিগ্রহ করে ওম্‌কারের নাম এবং জপ করতে-করতে যোগাভ্যাস করা উচিত।

৮. সহস্রার চক্র ঃ

এই চক্র তালুর ওপরে মস্তিষ্কে ব্রহ্মরন্ধ্রের ওপরে সব দিব্য শক্তির কেন্দ্র। এই চক্রের ওপরে প্রাণ এবং মনের নিগ্রহ দ্বারা প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি রূপ বৃত্তিগুলোর নিরোধ হলে অসম্প্রজ্ঞানত সমাধির প্রাপ্তি হয়ে পড়ে।

বিদ্বান যোগাভ্যাসী সাধকেরা এমনটা মনে করেন যে, উপনিষদে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়-পুরুষের বর্ণনা রয়েছে, সেটা এই ব্রহ্মরন্ধ্র-ই, যার ওপরে সহস্রার চক্র রয়েছে। কারণ এটা হচ্ছে অঙ্গুষ্ঠের আকার যুক্ত। এটাই

হচ্ছে চিত্তের স্থান, যাতে আত্মার জ্ঞানের প্রকাশ বা প্রতিবিম্ব পড়ছে। শরীরে জীবাত্মা কোথায় বাস করে? এটা এক অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। যদি এই প্রশ্নের ওপরে আমরা সাধারণভাবে ভাবনা-চিন্তা করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছব যে, আত্মার জ্ঞানের প্রকাশ চিত্তের ওপরে পড়ে। চিত্তই হচ্ছে কারণ-শরীর। এই কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই আত্মার সংজ্ঞা জীবাত্মা হয়। কারণ-শরীর সূক্ষ্ম-শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আর সূক্ষ্ম-শরীর স্থূল-শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই প্রকার জীবাত্মা গোটা দেহে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তবুও কার্যভেদে তার বেশ কয়েকটা স্থান বলা যেতে পারে।

সাধারণতঃ সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মা হৃদয়-প্রদেশে থাকে, কারণ হৃদয় হচ্ছে শরীরের মুখ্য কেন্দ্র। এখান থেকেই বিভিন্ন নাড়ি সম্পূর্ণ শরীরে যায়। শরীরের আভ্যন্তরীণ কার্য্যও এখান থেকেই হয়। হৃদয়-গতি থেকে গেলে শরীরের সব কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। এজন্য সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়কে জীবাত্মার স্থান বলা হয়। যেমনটা উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন
বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে।

(বৃহ. ২/১/১৭)

যখন এই পুরুষ (=আত্মা), যা বিজ্ঞানময়, গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে, তখন সে এই ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা, বিজ্ঞানকে নিয়ে, যা এই হৃদয়ের অন্তঃআকাশ, সেখানে বিশ্রাম করে।

স্বপ্নাবস্থায় জীবের স্থান কণ্ঠকে বলা হয়েছে, কারণ জাগ্রত অবস্থায় যে পদার্থ দেখা, শোনা এবং ভোগ করা হয়, সেসবের সংস্কার চুলের হাজার ভাগের এক ভাগ অংশ কণ্ঠে স্থিত এক হিতানামের নাড়িতে থাকা বলা হয়েছে। এজন্য অনুভূত পদার্থগুলোর সংস্কার রূপে সূক্ষ্ম জ্ঞান স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠে হয়। জাগ্রত অবস্থায় জীবাত্মা, যেহেতু বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা বাইরের বিষয়গুলোকে দেখে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে চোখ হচ্ছে প্রধান, তাই জাগ্রত অবস্থায় জীবাত্মার স্থিতি চোখে বলা হয়েছে।

য এষোऽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি।

(ছান্দো, ৮/৩/৪)

চোখে যে পুরুষ দেখতে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে আত্মা। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীবাত্মার স্থান আজ্ঞা চক্র বলা যেতে পারে, কারণ এটাই হচ্ছে দিব্য-দৃষ্টির স্থান। একে *'দিব্যনেত্র'* বা *'শিবনেত্র'*-ও বলা হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীবাত্মার স্থান হচ্ছে ব্রহ্মরন্ধ্র, এই স্থানে প্রাণ এবং মন স্থির হলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ সর্ববৃত্তি নিরোধ হয়ে পড়ে। চিত্র ১০-য়ের 'খ' ভাগে (১) সুষুম্না-শীর্ষ রয়েছে, (২) লঘু-মস্তিষ্ক, (৩) পঞ্চতন্ত্রমাত্র-মন্ডল দ্বারা ঘেরা, মন+বুদ্ধি+১০ ইন্দ্রিয়গুলোর সমষ্টি *'বিজ্ঞানময় কোষ'* বা *'সূক্ষ্ম শরীর'* রয়েছে। (৪) ব্রহ্মরন্ধ্র *(সহস্রার)*, (৫) অন্তঃ মস্তিষ্কের ভাগ রয়েছে, এখানে লাল ৩ চিহ্নকে *'অধিপতি রন্ধ্র'* বলা হয়।

চক্রগুলোর প্রতীকাত্মক বৈদিক নাম

বৈদিক সাহিত্যে মানব-শরীরগত মূলাধার ইত্যাদি চক্রগুলোর প্রতীকাত্মক বৈদিক নাম বা সংকেত 'ভূঃ', 'ভুবঃ' ইত্যাদি সপ্ত মহাব্যাহৃতির রূপে রয়েছে। যোগের আচার্য্য 'ভূঃ' নাম থেকে 'মূলাধার', 'ভূবঃ' থেকে 'স্বাধিষ্ঠান', 'স্বঃ' থেকে 'মণিপুর চক্র', 'মহঃ' থেকে 'হৃদয়' এবং 'অনাহত চক্র', 'জনঃ' থেকে 'বিশুদ্ধি চক্র', 'তপঃ' থেকে 'আজ্ঞা চক্র' আর 'সত্যম' থেকে 'সহস্রার'-এর গ্রহণ করেন। এই সব চক্র এক দিকে যেমন নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি আর প্রকাশের অধিকারী, অন্য দিকে এগুলো প্রাণময়, মনোময় আর বিজ্ঞানময় কোষগুলোর শক্তি এবং প্রকাশ দ্বারাও আবৃত্ত এবং প্রভাবিত। সুতরাং, সব চক্রে আসা মলিনতা আর এগুলোর ওপরে ছেয়ে থাকা আবরণ প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা দুর হয়ে পড়ে।

কুণ্ডলিনী শক্তি

মূলাধার চক্রে সন্নিহিত দিব্য শক্তিকেই অর্বাচীন তন্ত্রগ্রন্থগুলোতে কুণ্ডলিনী শক্তি এবং বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবর্চস বলা হয়েছে। সাধারণতঃ প্রাণশক্তি ইড়া এ বং পিঙ্গলা নাড়ি দিয়েই প্রবাহিত হয়। যখন ব্যক্তি সংযমপূর্বক প্রাণায়াম এবং ধ্যান ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়ার অভ্যাস করে, তখন সুপ্ত সুষুম্না নাড়িতে বিদ্যমান অদ্ভুত শক্তি বিকশিত হতে লাগে। যে শক্তির উপযোগ ভোগে হচ্ছিল, সেই শক্তি যোগাভ্যাস দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে ঊর্দ্ধগামী হয়ে ওঠে। আফলাতুন এবং পাইথোগোরাসের মত আত্মদর্শী বিদ্বানেরাও নিজেদের লেখায় এমনটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নাভির কাছে এমন এক দিব্য শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, যা মস্তিষ্কের প্রভুত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির প্রকাশকে উজ্জ্বল করে দেয়, যার ফলে মানুষের ভেতরে দিব্য শক্তি প্রকট হতে লাগে।

চক্র শোধন বা কুণ্ডলিনী জাগরণ

যে শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সেই শক্তিই এই পিণ্ডেও রয়েছে। শক্তির মূল আধার হচ্চে মূলাধার চক্র। মূলাধার চক্র জাগ্রত হলে দিব্য শক্তি ঊর্দ্ধগামী হয়ে ওঠে। এটাই হচ্ছে কুণ্ডলিনী জাগরণ। যেমন সব জায়গায় বিদ্যুতের তার বেছানো রয়েছে আর বাল্ব ইত্যাদিও লাগানো আছে, সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ মেন স্যুইচের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। যখন মেন স্যুইচ অন্ করা হয়, তখন সব যন্ত্রগুলোয় বিদ্যুৎ প্রবাহ হওয়ার ফলে সব জায়গা আলোকিত হয়ে পড়ে... ঠিক সেই প্রকার মূলাধার চক্রে সন্নিহিত দিব্য বৈদ্যুতিক শক্তি জাগ্রত হলে অন্য চক্রগুলোর জাগরণও আপনা থেকে হতে শুরু করে।

এই কুণ্ডলিনী শক্তি যখন ওপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন যেখানে-যেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি পৌঁছয়, সেখানে-সেখানে অধোমুখ চক্রগুলো ঊর্দ্ধমুখ হয়ে পড়ে। যখন এই শক্তি আজ্ঞা চক্রে পৌঁছয়, তখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং যখন এই শক্তি সহস্রার চক্রে পৌঁছয়, তখন সমস্ত বৃত্তির

নিরোধ হয়ে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আত্মা চিত্তে সন্নিহিত দিব্য জ্ঞানালোকও দেখতে পায়, যাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলা হয়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রাপ্তি হলে সাধকের পূর্ণ সত্যের বোধ হয়ে পড়ে এবং শেষে এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার পরে সাধকের নির্বীজ সমাধির অসীম, অনন্ত আনন্দের প্রাপ্তি হয়ে পড়ে। এটাই হচ্ছে যোগের চরম অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছে সংস্কার রূপে বিদ্যমান বাসনারও নাশ হয়ে পড়ায় সাধক জন্ম এবং মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির শাশ্বত আনন্দকে প্রাপ্ত করে নেন।

কুণ্ডলিনী জাগরণের উপায়

সিদ্ধ যোগেরঅন্তর্গত কুণ্ডলিনীর জাগরণ শক্তিপাত দ্বারা করা হয়। যদি কোন পরম তপস্বী, সাধনাশীল সিদ্ধ গুরু পাওয়া যায়, তাহলে ওনার প্রবলতম *'শক্তিসম্পাত'* অর্থাৎ মানসিক সংকল্প দ্বারা শরীরে ব্যাপ্ত *'মানস-দিব্য তেজ'* সঙ্কুচিত হয়ে ট্র্যানের সময় জ্যোতি বা ক্রিয়ার ধারা হয়ে উঠে শরীরে কাজ করতে থাকে। আত্ম-চেতনায় পূর্ণ এই তেজ এক চেতনের সমানই কার্য্যরত হয়ে পড়ে। সদ্‌গুরুর শক্তিপাত দ্বারা সাধককে বেশী শ্রম করতে হয় না, ওর সময় বেঁচে যায় এবং শীঘ্রই সাধনায় সফলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এমন শক্তিপাত করার মত সিদ্ধ পুরুষ পাওয়া অত্যধিক দুর্লভ। সুতারং, বর্তমানে হঠযোগ দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরিত করাটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও শ্রী গোরখনাথ জী *'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'*-তে নয় চক্রের বর্ণনা দিয়েছেন, তবুও ছয় চক্র — মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা চক্রের ও পরেই হঠযোগের সাধনা আধারিত হয়ে রয়েছে। এর ভেদনে সাধক সহস্রারে শিবের সাক্ষাৎকার করেন। ষট্‌কর্ম, আসন, প্রাণায়াম, মুদ্র, বন্ধ ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা শরীর যোগাগ্নিতে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। মল দ্বারাও নাড়ির চক্রের শোধন প্রাণায়াম দ্বারাই হয়। প্রাণ সাধনা দ্বারা নাড়ি শুদ্ধ হলে সাধক প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে বিষয়গুলো থেকে সরিয়ে আত্মভিমুখী করে দেন। ধারণা দ্বারা মনের নিশ্চলতার সঙ্গে পঞ্চভূতমুখী; জল, তেজ,

বায়ু আর আকাশের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে নেয়। চক্রভেদন করতে-করতে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করলে জীবাত্মা পরম শিবের সাক্ষাৎকার করে নেন। হঠযোগের চরম পরিণতি কুণ্ডলিনী জাগরণ দ্বারা চক্র ভেদন করে সহস্রারে শিবের সাক্ষাৎকার হয়। এটাই হচ্ছে উন্মনী সহজাবস্থা। আসন-সিদ্ধি হয়ে পড়লে প্রাণ-সাধনা, ধ্যান-সাধনা এবং সমাধি ইত্যাদিতে শীঘ্র সফলতা অর্জন করা যায়। ধ্যানাত্মক আসনে বসে মেরুদণ্ডকে সোজা রাখলে সুষুম্না থেকে বেরোন নাড়ি-গুচ্ছ *'প্রাণ'* সরলতার সঙ্গে যাতায়াত করতে লাগে। মেরুদণ্ড ঝুঁকে থাকলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়া স্নায়ু-গুচ্ছ, অনাবশ্যক এবং অবরোধক কফ ইত্যাদির সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়ার কারণে প্রাণ-প্রবেশের অভাবে মলিনই হয়ে থাকে। প্রাণায়াম রূপী প্রাণ-সাধনা দ্বারা শরীরগত প্রাণের বিষমতা দূর হয়ে সমতা এসে যায়। ধ্যান-ধারণার সাথে প্রাণায়াম করলে সর্বপ্রথম যোগাভ্যাসীর প্রাণময় কোষের ওপরে প্রভাব পড়ে, যার ফলে প্রাণময় কোষের সমস্ত ভাগ উত্তেজিত হয়ে উঠে রক্ত পরিভ্রমণকে তীব্রতর করে তুলে, স্থানে-স্থানে একত্রিত হয়ে শ্লেষ্মা ইত্যাদি মলকে ফুসফুস, ত্বক, অন্ত্র ইত্যাদি পথ দ্বারা বাইরে বের করে দেয়। ফলস্বরূপ, শরীরে অনেক প্রকারের বিচিত্র ক্রিয়া হতে লাগে এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। যোগে একে *'প্রাণোত্থান'* বলা হয়, যেটা হচ্ছে কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম সোপান। এতে বিশেষ রূপে প্রাণের গতিশীলতা-জন্য স্পর্শানুভূতি থাকে। লাগাতার অভ্যাসে প্রাণোত্থানের প্রকাশপূর্ণ পরের ভাগে শরীরে এখানে-ওখানে কিছু প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় এবং কুণ্ডলিনী জাগরণের পরের ভাগ শুরু হয়ে পড়ে। এই প্রকার প্রাণ-সাধনার প্রাণময় কোষের সাক্ষাৎকার হয়ে পড়ে। সমস্ত কোষ প্রাণের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে থাকে, সুতরাং চক্রে আসা মলিনতা আর এর ওপরে ছেয়ে থাকা আবরণ প্রাণায়াম দ্বারা দূর হয়ে পড়ায় শরীরগত চক্রগুলোর, চক্রে হওয়া ক্রিয়াগুলোর, এখানকার শক্তিগুলোর, এখানে-ওখানে কাজ করতে থাকা প্রাণগুলোর, উপপ্রাণগুলোর, ঈষু আর অধিপতিদের সাক্ষাৎকারও যথাসময় হয়ে পড়ে। প্রাণ সাধনার লাগাতার অভ্যাসে যখন চক্রগুলোয় অবস্থানকারী শক্তিগুলোর ওপরে আধিপত্য

হয়ে পড়ে, তখন মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত *'প্রাণশক্তি'*-কে স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চালিত করার সামর্থ্য দ্বারা সমস্ত চক্রের এবং উত্তরোত্তর পরবর্তী কোষগুলোর সাক্ষাৎকার করে নেওয়াটা অত্যন্ত সরল হয়ে ওঠে। চিত্র ১১ *'সৌষুম্ন-জ্যোতি'*-র প্রদর্শন করছে যে, প্রাণায়াণের লাগাতার অভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে পড়া নাড়ি-জালপ, প্রাণ আর সুষুম্নার সমস্ত পথ আলোকিত হয়ে উঠেছে। কপালস্থ 'সক্ষ্ম শরীরে'-এর মুখ্য ভাগ বুদ্ধি (১) থেকে প্রেরিত মন (২)-এর প্রকাশ সুষুম্না-শীর্ষ (৩)-এর পথ দিয়ে এগিয়ে চলে সমস্ত *'নাড়ি-যুগল'* (৫)-কে প্রকাশিত করতে-করতে মূলাধার চক্র (৪) দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।

পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে লাগাতার প্রাণ-সাধনার অভ্যাস করতে-করতে যেমন-যেমন অন্ধকারের ক্ষীণ হয়ে ওঠে, মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র এবং ওপরে সহস্রার পর্যন্ত সব চক্র প্রকাশিত হতে লাগে। চিত্র (১২) প্রাণায়াম সিদ্ধি হলে প্রকাশিত হওয়া চক্রগুলোর পূর্ব রূপ প্রদর্শিত করছে। সব থেকে নীচে রয়েছে হোমকুণ্ড-সম *'মূলাধার চক্র'* এবং এর ওপরে *'স্বাধিষ্ঠান চক্র'* রয়েছে। তার ওপরে নাভিতে অবস্থিত রয়েছে *'মণিপুর চক্র'*, বিভিন্ন নাড়ি দ্বারা ঘেরা এই চক্র থেকে অনাহত শব্দ-লহরী উঠতে থাকে, এর ওপরে বক্ষে দীপশিখা-সম প্রকাশিত 'হৃদয়-চক্র' এবং 'অনাহত চক্র' রয়েছে, কণ্ঠে রয়েছে কণ্ঠের মত দেখতে 'বিশুদ্ধি চক্র', ভ্রূমধ্যে রয়েছে অগ্নিশিখা-সম আলোকিত *'আজ্ঞা চক্র'* এবং সবার ওপরে কপালে রয়েছে সূর্য্য-সম প্রকাশিত *'সহস্রার'*।

এইসব চক্রের এই পূর্ব রূপই সাধক সর্বপ্রথম দেখতে পান। ধ্যানের দ্বারা অন্তঃ সাক্ষাৎকার এবং অতি দূরদর্শন হয়ে পড়ে। চিত্র ১৩ এটা স্পষ্ট করছে — চিত্র (১)-তে জীবাত্মার জ্যোতি সদা চিত্ত অবস্থিত বিজ্ঞানময় কোষ (৪)-কে প্রেরিত করে নেত্রকে দিব্যতা প্রদান করে, মন (৩) নিজের রশ্মি (৭)-এর দ্বারা অন্তঃ নেত্র (৫)-কে দিব্য বানাচ্ছে। যোগাভ্যাসীর সংকল্প-শক্তি দ্বারা প্রেরিত *'দিব্য-দৃষ্টি'* (৫) নিজরশ্মিপ্রবাহ (৪)-র দ্বারা দ্যুলোকে সূর্য মন্ডলেরও ওপার পর্যন্ত এবং ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে (৯)র দ্বারা পাতাল পর্যন্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয়।

এই শক্তি-কেন্দ্র অর্থাৎ চক্র মেরুদণ্ডগত সুষুম্না নামক জ্যোতির্ময়ী নাড়িতে সূক্ষ্ম বীজের রূপে অবস্থিত। চিত্র ১৪ রহস্যময়ী সুষুম্নার, যার মধ্যে ১.তে দেখাচ্ছে যে, ছোট-বড় ৩৩ কশেরু দিয়ে তৈরী সর্পাকার মেরুদণ্ডে থাকা লাল রং-য়ের *'সুষুম্না'*-ও সর্পাকার হয়ে রয়েছে। *'ক'* হচ্ছে সুষুম্না-শীর্ষ, যা মস্তিষ্কের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে আর *'খ'* হচ্ছে এর লেজ, যা পুচ্ছাস্থি বা গুদাস্থির সঙ্গে মিলে রয়েছে। ২ সুষুম্নার আভ্যন্তরীণ স্থিতিকে স্পষ্ট করছে — *'ক'*, দুই কুশেরুর মাঝ থেকে বেরোন নাড়ি যুগল, যা শরীরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। *'খ'* সুষুম্নার বাহ্য আবরণকে কেটে দেখলে এই নাড়ি যুগলের বাস্তবিক স্থিতিকে স্পষ্ট করে তুলছে। *'গ'* হচ্ছে সুষুম্নার ব্যস্ত কাটাই। *'ঘ'* হচ্ছে প্রতিটি কুশেরু-যুগলের মাঝে রাখা মাংসপেশীর গদী। *'ঙ'* — *'ক'* থেকে শুরু করে *'ভ'* পর্যন্ত নাড়ি-যুগল এই প্রকার বেরিয়ে-বেরিয়ে শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে।
'চ' ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পিঠের দিকে সব কুশেরুগুলোর মাঝেও মাংসপেশী লেগে রয়েছে। ৩ আর ৪-তে প্রস্থের দিকে কাটা সুষুম্নার সেই আভ্যন্তরীণ ভাগ দেখানো হয়েছে, যাতে মাকড়শার জালের থেকেও সূক্ষ্ম *'জ্ঞান বহা'* এবং *'গতি বহা'* নাড়ির জাল বেছানো রয়েছে। এই জাল এক সেকেন্ডও বিশ্রাম না নিয়ে চব্বিশ ঘন্টাই কাজ করে চলে। ৫-তে সুষুম্না এবং তার সাথে ডান দিক-বাঁ দিকে *'পিঙ্গলা'* আর *'ইড়া'* নামক দুটো মুখ্য নাড়িও ওপরের দিক থেকে এসেছে আর গুদাস্থির কাছে এসে মিলে গেছে। বিভিন্ন গাঁটে বোনা ইড়া-পিঙ্গলাকে একটা মালার মত দেখায়।
সমস্ত শরীরের *'জ্ঞান'* এবং ক্রিয়ার সংমিশ্রণ দ্বারা তৈরী জীবনী শক্তির প্রসারের মুখ্য সাধন হচ্ছে সুষুম্নাই।
পৃষ্ঠা ৫৬-তে *'চক্র দর্শন তালিকা'* দেওয়া হয়েছে, যাতে চক্র সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ম তথ্য সমন্বিত রূপে পাঠকবৃন্দ পেতে পারেন।
এই প্রকার এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মূলাধার চক্র জাগ্রত হয়ে উঠলে অন্য চক্রগুলোরও জাগরণ আপনা থেকেই হতে লাগে আর দিব্য শক্তি উর্দ্ধগামী হয়ে ওঠে — এটাই হচ্ছে কুণ্ডলিনী জাগরণ। বৈজ্ঞানিক শব্দে

বলতে গেলে — এই কুণ্ডলিনী হচ্ছে সেই মানস-দিব্য-তেজ, যা গোটা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সাধককে প্রাণ-সাধনা দ্বারা চক্রের শোধন, ভেদন আর জাগরণ নিম্নলিখিত মুখ্য উপায়গুলো দ্বারা *(কোন সৎপুরুষ যোগ সাধকের থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করে)* করা উচিত।

১. ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম প্রতিদিন সকাল সন্ধে কমপক্ষে ৩ মিনিট এবং তার পরে কপালভাতি প্রাণায়াম কমপক্ষে ৫ মিনিট করা উচিত। কপালভাতি প্রাণায়াম শুরুর দিকে করার সময় মাঝেমাঝে বিশ্রাম করে নিন। এমনটা করলে প্রায় এক মাসে আপনি প্রায় ৫ মিনিট পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন।

২. ভস্ত্রিকা আর কপালভাতি প্রাণায়াম করার পরে ১১ বার পর্যন্ত যথাশক্তি ত্রিবন্ধপূর্ণক বাহ্য প্রাণায়াম করুন।

৩. এই তিনটে অভ্যাস হয়ে পড়ার পরে মূলাধার চক্র সমেত সমস্ত চক্রগুলোর শোধক এবং চক্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ৭২ কোটি, ৭২ লক্ষ, ১০ হাজার, ২১০ নাড়ির শুদ্ধির জন্য প্রতি দিন সকাল-সন্ধ্যে অনুলোম-বিলোম প্রাণায়ামের কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত না থেমে লাগাতার এবং তারতম্যপূর্বক অভ্যাস করার চেষ্টা করুন। যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে দু বেলা প্রাণায়াম না করতে পারেন, তাহলে সকালবেলার প্রাণায়াম চালিয়ে যান। সকালের প্রাণায়াম বন্ধ করবেন না... যদিও বন্ধ করে দিলেও কোন প্রকারের ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনার যা লক্ষ্য, সেটা প্রাপ্ত করতে বিলম্ব হবে। এজন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত লাগাতার শ্রদ্ধাপূর্বক অভ্যাসই আপনাকে আপনার লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

শুরুতে আপনি অনুলোম-বিলোম প্রাণায়ামকে ভাগে-ভাগে করুন। যেমন ধরুন — এক মিনিট প্রাণায়াম করার পরে একটু বিশ্রম করে নিন। ক্লান্তি দূর হয়ে পড়লে আবার একবার প্রাণায়ামের অভ্যাস করুন। এই ভাবে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে-করতে প্রায় এক থেকে দু মাসে আপনি প্রায় ৫ থেকে ১০ মিনিট এই অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন। প্রত্যেক প্রাণায়াম

করতে-করতে প্রতিটা শ্বাস-প্রঃশ্বাসের সঙ্গে মানসিক রূপে ওঁ-য়ের মানসিক জপ, চিন্তন এবং মননও অবশ্যই করুন, কারণ প্রাণায়ম এবেং ধ্যানের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রাণায়াম দ্বারা অত্যন্ত চঞ্চল মনও আপনা থেকেই একাগ্র হয়ে ওঠে আর একাগ্র হয়ে ওঠা মন যখন ওম্‌কারে সমাহিত হয়ে পড়ে, তখন ধ্যান আর সমাধি সহজেই প্রাপ্ত হতে লাগে।

৪. পূর্বনির্দিষ্ট বিধিগুলো অনুসরণ করার পরে সহজতাপূর্বক নাকের পাটায় হাত না লাগিয়েই নাড়ি শোধন প্রাণায়ামের অভ্যাস অত্যন্ত দ্রুত গতিতে করতে থাকুন। প্রত্যেক শ্বাসের সাথে মনে-মনে, ওম্‌কারের অর্থপূর্বক জপ, চিন্তন এবং মনন করতে থাকুন। এই ভাবে ৩ থেকে ১১ বার পর্যন্ত নাড়ি শোধন প্রাণায়াম অবশ্যই করুন।

৫. উপরিক্ত প্রামায়ামগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা *'প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া'* প্রকরণে পড়ুন।

৬. শেষে প্রাণের সাথে মনকে একাগ্র করে অন্তঃযাত্রা করুন। এই প্রকার প্রাণের সাথে ওম্‌কারের নিরন্তর ধ্যান করলে আপনি যোগের উচ্চতম ক্ষিতিজে পৌঁছতে পারবেন। ওম্‌কারের জপ-ধ্যান দ্বারা ক্রমপূর্বক উৎপন্ন কম্প *'মুলাধার চক্র'*-তে বিচিত্র শিহরণ উৎপন্ন করে, শিহরণ বা হর্ষদায়ক এই তরঙ্গ *'প্রাণময় কোষ' (স্নায়ুমন্ডল)*-য়ের মাধ্যমে *'স্বাধিষ্ঠান-জ্বচক্র'*-তে 'তড়িত' নামক *(প্রাণের তাড়না থেকে উৎপন্ন কম্পন),* বিদ্যুতময়-প্রকল্প প্রকট হয়ে নাভিতে এক *'নাদ' (অস্ফুট-শব্দ)* উৎপন্ন করে দেয়, যার ফলে উদরে বিশেষ উষ্মা প্রতীত হয়। উদরে উৎপন্ন উষ্মা সংকল্পে পরিণত হয়ে পড়ে। জপ-ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন বিশেষ প্রকারের আঘাত-কম্পন স্নায়মন্ডল দ্বারা বিদ্যুত-তরঙ্গে রূপে প্রাণময়-কোষে প্রবিষ্ট হয়, যখন কোন প্রবাহ আমাদের মস্তিষ্ক থেকে চলে স্নায়ুমন্ডলের দ্বারা নাভিগত মণিপুর-চক্রকে প্রভাবিত করে। ওম্‌কারের জপ-ধ্যানের তাৎপর্য হল এটা যে, *'প্রাণ'*-কে নিম্ন স্তর থেকে তুলে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং *'মন'*-কে প্রাণের ক্রিয়াময় ক্ষেত্র থেকে তুলে 'বিজ্ঞানময় কোষ'-এর এবং 'মন-বুদ্ধি'-

কে আনন্দময় কোষের স্তরে নিয়ে গিয়ে স্থির করে দেওয়া অর্থাৎ করমশঃ দেহ প্রাণাদির অভ্যাসের অভাব অনুভব করতে-করতে *'প্রাণময়', 'মনোময়', 'বিজ্ঞানময়'* কোষগুলোকে পার করে শরীরে ছড়িয়ে থাকা *'আত্মচেতনা'*-কে গুটিয়ে এনে সেটাকে হৃদয়গত চিত্রের বানানো *'আনন্দানুগত'* এবং *'অস্মিতানুগত'* সমাধিতে স্থির করে দেওয়া অথবা স্বয়ং তাতে স্থিত হয়ে যাওয়া।

প্রণবকে বাদ দিয়ে বেদের সব থেকে মহান মন্ত্র গায়ত্রীর ধ্যান চিত্র ১৫ অনুযায়ী করা যেতে পারে। সাধক চিত্রে প্রদর্শিত সংখ্যা ৩ অনুযায়ী নিজের মস্তিষ্কে কপালের ভেতরে ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করুন এবং এমনটা *'ধ্যান'* করুন যে, আমার মস্তিষ্ক এই সময় *'দিব্য প্রকাশ'*-তে ভরে উঠছে, এবার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আমার বাসন্তী-সোনালী রঙের বুদ্ধিমন্ডলে (২) টর্চের মত বাঁধা দিব্যলোক থেকে আসা জ্যোৎস্নার মত এক অত্যন্ত সাদা জ্যোতি প্রবিষ্ট হচ্ছে। বিজ্ঞানময়-কোষের স্বামিনী বুদ্ধি পরম সাত্ত্বিক সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠার ফলে ইন্দ্রিয়রাজ *'মন'* এবং তাঁর অধিনস্থ *'ইন্দ্রিয়'*-গুলো আপনা থেকেই নির্মল-শুদ্ধ-পবিত্র হয়ে উঠছে। তখন দিন-রাত মস্তিষ্ক আর হৃদয়ে আনন্দ এবং পরম শান্ত অপার জ্যোতির তরঙ্গ উঠতে থাকে।

ওম্‌কার জপ বা গায়ত্রী জপকে বাদ দিয়ে সাধক ইচ্ছে করলে চিত্র ১৬ অনুযায়ী *'দিব্য আলোক'*-য়ের ধ্যান করতে পারেন। মহা তেজস্বী সহস্রাক্ষ ভগবান (১) আমাকে *'ব্রহ্মতেজ'* প্রদান করছেন এবং ব্রহ্মতেজ হৃদয়ে সূর্য (২) সমান দেদীপ্তমান হয়ে উঠছে আর বিশুদ্ধ সৌম্য জ্যোতির রূপে সেই ঈশ আমার সামনে রয়েছে, আমার আত্মা (৩)-তে প্রকট রয়েছে। এই দিব্যতম জ্যোতি আমার জীবন পথকে আলোকিত করে তুলে আজীবন আমার সাথী হয়ে থাকুক।

চক্রদর্শন তালিকা

চক্রের নাম	স্থূল স্বরূপ	স্থান	তত্ত্ব	বীজ	মুখ্য বায়ু	গৌণ বায়ু	কোষ	লোক	চক্র লাগাতার গতিশীল না থাকলে উৎপন্ন হওয়া ব্যাধি
মূলাধার	Pelvic Plexus	জননেন্দ্রিয় এবং পায়ুর মাঝে প্রাণ ১ ইঞ্চি ভেতরে	পৃথ্বী	লং	অপান	কূর্ম	অন্নময়	ভূঃ	কোষ্ঠকাঠিন্য পাতলা পায়খানা, বমি
স্বাধিষ্ঠান	Hypogstric Plexus	মূলাধার চক্রের ওপরে 1"-15" (কোমারের কাছে)	জল	বং	ব্যান	ধনঞ্জয়	প্রাণময়	ভুবঃ	অনিদ্রা, পথরী
মণিপুর	Epigastirc or Solar Plexus	নাভির কাছে	অগ্নি	রং	সমান	কৃকল	মনোময়	স্বঃ	হাঁফানী, সন্ধিবাত, অর্শ, হাড়ের দুর্বলতা
অনাহত	Cardiac Plexus	হৃদয়	বায়ু	যং	প্রাণ	নাগ	বিজ্ঞানময়	মহঃ	জ্ঞান তন্তুগুলোর তন্ত্র খারাপ খারাপ হওয়া, বায়ু, মূর্চ্ছা, দন্ত
হৃদয় চক্র বা মনশ্চক্র	Lower Mind Plexus	দুই স্তনের মাঝে	এটা শরীরের স্থূল ভাগ নয়, বরং ভাবাত্মক ভাগ, যার সম্পর্ক চিত্তের সঙ্গে রয়েছে						
বিশুদ্ধি	Carotid Plexus	কণ্ঠ	আকাশ	হং	উদান	দেবদত্ত	আনন্দময়	জনঃ	ফোড়া-ফুসকুরী, গাঁট, ফোলা ভাব, পুঁজ, চোখে নোংরা
আজ্ঞাচক্র	Medula Plexus	ভ্রূমধ্য (কপালের একটু পেছনে)	মনস	ওঁ				তপঃ	জলোদর, শ্বাস এবং ফুসফুসের রোগ, হৃদয় গতি বৃদ্ধি
সহস্রার	Cerebral Gland	কপাল (তালুর ওপরে, মস্তিষ্কে ব্রহ্মরন্ধ্রের ওপরে)	মহত্তত্ত্ব					সত্যম	

ধ্যানের জন্য কিছু পথনির্দেশ

১. ধ্যান করার সময় ধ্যানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিন। ধ্যানের সময় অন্য কোন বিষয়, তা সেটা যত শুভই হোক না কেন, গুরুত্ব দেবেন না। দান করা, সেবা এবং পরোপকার করা, বিদ্যাধ্যয়ন, গুরু সেবা এবং গো সেবা ইত্যাদি হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র কার্য্য, কিন্তু ধ্যান করার সময় এগুলোরও চিন্তা করবেন না। ধ্যানের সময় চিন্তন, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সাক্ষাৎকারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বর।

২. ধ্যান করার সময় মন এবং ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করে তুলুন এবং ধ্যানের আগে প্রতি দিন মনে-মনে এই চিন্তন অবশ্যই করুন যে, আমি প্রকৃতি, ধন, ঐশ্বর্য্য, ভূমি, ভবন, পুত্র, পৌত্র, ভার্যা ইত্যাদি রূপ নই। এসব ব্যক্ত-অব্যক্ত সত্ত্ব আমার স্বরূপ নয়। আমি সমস্ত জড় এবং চেতন বাহ্য পদার্থের বন্ধনের থেকে মুক্ত। এই শরীরও আমার স্বরূপ নয়। আমি শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ ইত্যাদি থেকে রহিত। আমি মন এবং মনের বিষয় — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহংকার ইত্যাদি বাসনা রূপ নই। আমি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ রূপ পঞ্চক্লেশ থেকেও রহিত। আমি আনন্দময়, জ্যোতির্ময়, শুদ্ধসত্ত্ব। আমি হচ্ছি অমৃতপুত্র। আমি সেই ব্রহ্মের অংশ। যেমন জলের ফোঁটা সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে উঠে, তারপর আবার মাটিতে পড়ে নদীর প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আবার সাগরেই সমাহিত হয়ে পড়ে, সাগরকে ছেড়ে জলের ফোঁটা যেমন থাকতে পারে না, আমিও তেমন সেই আনন্দের সিন্ধু পরমেশ্বরে ফোঁটা থেকে সমুদ্র রূপ হতে চাই। সেই বিধাতা আমাদের জীবন, প্রাণ, শক্তি, গতি, তেজ, শান্তি, সুখ আর সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য প্রদান করেন। প্রভুই আমাদের শক্তি, জন্ম, আয়ু, শরীর, বুদ্ধি, শরীরের সাধন, ঘর-পরিবার, মাতা-পিতা ইত্যাদি সব কিছু প্রদান করেছেন। সেই প্রভু আমাকে সতত আনন্দ দিয়ে আসছেন... প্রভুর

শান্তি এবং পরম সুখ আমার ওপরে সব দিক থেকে বর্ষিত হচ্ছে। এক মুহূর্তও সেই আনন্দময়ী মাতা এবং পরম রক্ষক পিতা আমাকে নিজেদের থেকে দূর করেন না। আমি সদা প্রভুর মধ্যে রয়েছি আর প্রভু সদা আমার মধ্যে রয়েছেন, এই তাদাত্ম্য ভাব, তদ্রূপতা এবং তদাকার ভাবই আমাকে পরম আনন্দ প্রদান করবে। ভগবান নিজের আনন্দের অজস্র বৃষ্টি করে চলেছেন। যদি আমরা এরপরেও সেই আনন্দকে অনুভব না করতে পারি, তাহলে সেটা আমাদেরই দোষ।

৩. সাধককে সর্বদা বিবেক-বৈরাগ্যের ভাবে থাকা উচিত। স্বয়ংকে দ্রষ্টা, সাক্ষীতে অবস্থিত করে অনাসক্ত ভাবে সমস্ত শুভ কার্যকে ভগবানের সেবা মনে করা উচিত। কর্তৃত্বের অহংকার এবং ফলের অপেক্ষা রহিত কর্মই হচ্ছে ভগবানের ক্রিয়াত্মক ধ্যান।

৪. বাহ্যসুখ প্রাপ্তির বিচার এবং সুখের সমস্ত সাধন... সব হচ্ছে দুঃখরূপ। সংসারে যতক্ষণ পর্যন্ত সুখ বুদ্ধি বজায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎ সমর্পণ, ঈশ্বর-প্রণিধান হতে পারবে না এবং ঈশ্বর-প্রণিধান ছাড়া ধ্যান এবং সমাধি পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব নয়।

৫. এই প্রকার প্রত্যেক সাধকের প্রতি দিন কমপক্ষে এক ঘন্টা জপ, ধ্যান এবং উপাসনা অবশ্যই করা উচিত। এমনটা করলে এই জন্মে সম্পূর্ণ দুঃখের সমাপ্তি এবং পরম পিতা পরমেশ্বরের অনুভূতি হতে পারে। এটা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, জীবনের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে আত্মসাক্ষাৎকার এবং প্রভু প্রাপ্তি, বাকী সব কার্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে গৌণ। আমরা যদি এই জীবনে এখন থেকে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পথে এগোন শুরু না করি, তাহলে উপনিষদের ঋষি বলেছেন ঃ

इह चैदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति।।

– केनोपनिषद् २.५

এই মন্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে এটা যে, যে ব্যক্তি এখন থেকে ধর্মবিচারে রত হয়ে পরমাত্মাকে জানার চেষ্টা করবে, সেই সফল হতে পারবে। এর ঠিক বিপরীত, যে ব্যক্তি জীবনকে কেবলমাত্র সংসারী কাজে লাগিয়ে রাখে, সে নিজের প্রচণ্ড বড় ক্ষতি করছে। এজন্য, যোগ

এবং ধ্যানের আমাদের জীবনে প্রয়োজন রয়েছে — এমনটা বুঝে নিয়ে নিত্য ধ্যানাবস্থিত হয়ে আত্মচিন্তন করা উচিত। এই পুরো প্রক্রিয়ায় কিছু অত্যন্ত আবশ্যক নিয়ম এবং সতর্কতাও রয়েছে, যার পালন প্রত্যেক সাধকের করাটা নিতান্ত আবশ্যক।

নিয়ম ঃ

১. ব্রহ্মচর্যের পালন করা অত্যন্ত আবশ্যক। গৃহস্থ ব্যক্তিও সাধনার এই সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা পরম আনন্দ প্রাপ্ত করতে পারবেন। এর জন্য ওনাকেও পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তির জন্য ক্ষণিক বিষয় সুখকে ত্যাগ করতে হবে। অন্যথা পূর্ণ উন্নতি সম্ভব হবে না।

২. আহারের শুচিতা এবং সাত্ত্বিকতার ওপরেও অবশ্যই দৃষ্টি দিন। যুক্ত-আহার, যুক্ত-নিদ্রা এবং সংযমিত ব্রহ্মচর্য ছাড়া তো সুস্থ থাকাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে... এজন্য যোগাভ্যাসীর তো আহার, নিদ্রা এবং ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলোর পালন করাটা আবশ্যক হয়েই ওঠে।

৩. যম এবং নিয়মের পালন করা ছাড়া কোন ব্যক্তি যোগী হতে পারেন না। এজন্য কুণ্ডলিনী জাগরণ, চক্রগুলোর পূর্ণ শোধন, ভেদন এবং সমাধির স্থিতিকেও প্রাপ্ত করার জন্য যম, নিয়মের পূর্ণ পালন অতি আবশ্যক। এমনিতেও আপনি যখন প্রতি দিন পূর্ব নির্দিষ্ট বিধিতে যোগাভ্যাস করবেন, তখন যম, নিয়মের পালনও আপনার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়বে। কারণ অহিংসা এবং সত্যাদি হচ্ছে আপনার সহজ এবং স্বাভাবিক গুণ। আপনি ভয়ভীত হবেন না যে, যম, নিয়মের পালন তো আমি করতে পারব না... তাহলে আমি পূর্ণ যোগী তো হতে পারব না... এমনটা ভয় পাবেন না। ব্যস্... আপনি শুধু পূর্ব নির্দিষ্ট বিধিতে যৌগিক প্রক্রিয়া করে চলুন, আপনার জীবন যোগময় হয়ে উঠবে। অহিংসা এবং সত্য ইত্যাদি যম, নিয়মে আপনার আস্থা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস এতটা দৃঢ় হয়ে উঠবে যে, আপনার অসত্য ইত্যাদি বলার ইচ্ছাই আর হবে না। কারো প্রতি হিংসার ভাবও আপনার মনে জাগ্রত হবে না। এজন্য যোগকে সহজ বলা হয়। কারণ যোগ হচ্ছে আমাদের স্বধর্ম।

সতর্কতা ঃ

১. পূর্ব নির্দিষ্ট সব বিধি সব ব্যক্তিই করতে পারেন... কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ, হৃদয় এবং হাঁফানী, শ্বাস রোগী ব্যক্তির প্রাণায়ামের বিধি ধীরে-ধীরেই করা উচিত, ওনারা যেন কোন প্রাণায়াম অতি শীঘ্রতার সঙ্গে না করেন। এমনটা করলে ওনাদের সেই সব রোগ দূর হবে এবং যোগে উন্নতি হবে... অন্যথা অতি শীঘ্রতার সঙ্গে প্রাণায়াম করলে উচ্চ রক্তচাপ বাড়তে পারে এবং হৃদয় আর হাঁফানী রোগীদেরও সমস্যা হতে পারে। নিজের শারীরিক ক্ষমতার ব্যাপারটাও সবার মাথায় রাখা উচিত। নিজের শারীরিক শক্তির অতিক্রমণ করতে যাবেন না।

২. শৌচাদি থেকে নিবৃত্ত হয়েই এই প্রক্রিয়া করা উচিত। আপনার যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, তাহলে কিছুদিন ত্রিফলা ইত্যাদি কোন সোম্য রেচক ঔষধির প্রয়োগও করা যেতে পারে। কিছু দিনের অভ্যাসের পরে কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমস্ত রোগ আপনা থেকে দূর হয়ে পড়বে।

৩. এই পূর্বনির্দিষ্ট বিধি করলে সাধকের জঠরাগ্নিও অত্যন্ত তীব্র হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধকের সৌম্য, মধুর এবং পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করা উচিত। গোঘৃত, গোদুগ্ধ, ঋতুর অনুকূল ফল এবং বাদাম ইত্যাদি ভিজিয়েও সেবন করা যেতে পারে। হৃদরোগ, কোলেষ্ট্রল, উচ্চ রক্তচাপ হলেও গোঘৃত অত্যন্ত অল্প মাত্রায় এবং গোদুগ্ধায় ভেজানো বাদাম অল্প মাত্রায় সেবন করা যেতে পারে।

৪. গ্রীষ্মকালে সংক্ষিপ্ত অভ্যাস করা উচিত।

৫. একবার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে পড়লে এমনটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, বিনা চেষ্টা এবং বিনা অভ্যাসে সর্বদা এমনটা হতে থাকবে। এর জন্য মন এবং শরীরের সুস্থ অবস্থা, নির্মলতা, শুচিতা, সূক্ষ্মতা, বিচারে প্রবিত্রতা এবং বৈরাগ্যের লাগাতার বজায় থাকাটা অত্যন্ত আবশ্যক। এর অভাবে কার্য্য বন্ধ হতে পারে।

৬. এই পথে সাধকদের আড়ম্বর এবং Fashion-এর থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে শান্ত, সরল, সহজ এবং নিরহংকারী, মিতভাষী হয়ে থাকা উচিত। প্রশংসা, যশ, কীর্তি ইত্যাদির কামনা কখনোই করা উচিত নয়।

কুণ্ডলিনী জাগরণের লক্ষণ এবং লাভ

কুণ্ডলিনী জাগরণের আত্মিক লাভের অভিব্যক্তি শব্দের মাধ্যমে তো করা সম্ভব নয়... তবে হ্যাঁ, এতটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, এটা হচ্ছে এক পূর্ণ আনন্দের স্থিতি। এই স্থিতিকে প্রাপ্ত করার পর আর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। মনে পূর্ণ সন্তুষ্টি, পূর্ণ শান্তি এবং পরম সুখের অনুভূতি হয়। এমন সাধকের পাশে বসলে অন্যদেরও শান্তির অনুভূতি হয়। এমন যোগী পুরুষের কাছে বসলে অন্য বিকারগ্রস্ত পুরুষেরও বিকার শান্ত হয়ে পড়ে এবং যোগ আর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও যে ব্যক্তির কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে পড়ে, তার মুখে এক দিব্য আভা, তেজ এবং কান্তি ফুটে ওঠে। শরীরেও লাবণ্য আসতে লাগে। মুখে প্রসন্নতা এবং মমতার ভাব থাকে। দৃষ্টিতে মমতা, করুণা এবং দিব্য প্রেম থাকে। হৃদয়ে বিশালতা, উদারতা এবং পরোপকার ইত্যাদির দিব্য ভাব থাকে। বিচারে মহানতা এবং পূর্ণ সাত্ত্বিকতা থাকে। সংক্ষেপে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, সেই ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ণ পবিত্র, উদাত্ত এবং মহানতাকে ছুঁয়ে থাকে।

এই পুরো প্রক্রিয়ার এক দিকে যেমন আধ্যাত্মিক লাভ রয়েছে, অন্য দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা লাভ এটাও হচ্ছে যে, এমন যৌগিক প্রক্রিয়া করা ব্যক্তিকে কোন রোগ ছুঁতে পারে না এবং ক্যান্সার থেকে শুরু করে হৃদরোগ, ডায়াবেটিজ, মোটাপণ, পেটের সমস্ত রোগ, বাত, পিত্ত এবং কফের সমস্ত বিষমতা আপনা থেকেই দুর হয়ে পড়ে। ব্যক্তি পূর্ণ নীরোগী হয়ে ওঠে। আজকের যুগের স্বার্থপর মানুষদের জন্য এটা কি কম প্রাপ্তি যে, কোন রমের ওষুধ সেবন না করেই সব রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে এবং সারা জীবন নীরোগ, সুস্থ, তেজস্বী, মনস্বী এবং তপস্বী হয়ে থাকা যেতে পারে।

পরিচয়

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্ট, কনখল

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্টের মুখ্যালয় কৃপালু বাগ আশ্রমে অবস্থিত। কৃপালু বাগ আশ্রমের স্থাপনা ১৯৩২-তে শ্রী স্বামী কৃপালুদেবজী মহারাজ করেছিলেন, যিনি মূল রূপে বীর ভূমি মেবাড় *(রাজস্থান)*-এর লোক ছিলেন এবং সন্ন্যাস নেবার আগে ওনার নাম ছিল যতি কিশোরচন্দ। স্বাধীনতা আন্দোলনে যতি কিশোরচন্দজী এক সক্রিয় বিপ্লবীর সফল ভূমিকা পালন করেছিলেন। হরিদ্বারে উনি বেশ কিছু বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছিলেন। স্থানীয় স্বাধীনতা সেনানী বেণী প্রসাদ জিজ্ঞাসু ছিলেন ওনার প্রমুখ সহযোগীদের অন্যতম। যতি কিশোরচন্দ হরিদ্বারে সব থেকে প্রথম পাব্লিক লাইব্রেরীর স্থাপনা করেছিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সাড়ে তিন হাজার পুস্তক একত্রিত করে আপার রোড স্থিত এই পুস্তকালয়ে রাখেন। রাষ্ট্র নির্মাণ যোজনাকে কার্যরূপ প্রদান করার জন্য উনি বেশ কয়েক ডজন পাঠশালারও স্থাপনা এই এলাকায় করেন। গুরুকুল কাঙ্গরী-র সংস্থাপক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সঙ্গে ওনার সম্পর্ক বড়ই মধুর এবং ঘনিষ্ঠ ছিল। পরে উনি বাল গঙ্গাধর তিলক, মদন মোহন মালব্য, মোতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, বি.জে. প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁর-ও গভীর সান্নিধ্যে আসেন।

যতি কিশোরচন্দ বঙ্গ বিপ্লব দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দল দ্বারা প্রকাশিত *'যুগান্তর'* এবং লোকান্তর পত্রের উত্তর ভারতে প্রসারিত করার অত্যন্ত বড় ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বভার সামলান। বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত এই সংবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারের চোখের বালি হয়ে উঠেছিল। বিদেশী সরকার আগুন উগরোতে থাকা এই সংবাদপত্রের নামে থরথর করে কাঁপত। এই সংবাদপত্র কোথা থেকে ছাপা হত, সেটা কেউই জানতে পারে নি। যতি কিশোরচন্দ এই সংবাদপত্র কখনো হরিদ্বারের চণ্ডী পাহাড়, কখনো নীলধারা তলহটি, বা কখনো পালীবাল ধর্মশালায় অবস্থিত নিজের লাইব্রেরী থেকে

খামে পুরে-পুরে গোটা দেশে পোষ্ট করতেন। এই সময়ে বঙ্গ বিপ্লব দল দিল্লীতে লর্ড হার্ডিং বোমাকান্ড ঘটায়... যার নায়ক ছিলেন মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বোস। হরিদ্বারে ওনাকে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব যতি কিশোরচন্দের ওপরেই সঁপে দেওয়া হয়েছিল। রাসবিহারী বোসের ওপরে ব্রিটিশ সরকার সেই যুগে তিন লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। যতি কিশোরচন্দ ওনাকে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত নিজের আশ্রমে রেখেছিলেন। ঠিক তখনই ওনার বন্ধু হরিশবাবু নিজের আরও তিন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারে আসেন এবং জানান যে, ইংরেজ সরকার রাসবিহারী বোসের হরিদ্বারে বা দেহরাদুনে কোথাও লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে জানতে পেরে গেছে এবং যে কোন সময় পুলিশ হানা দিতে পারে। তখন যতি কিশোরচন্দ ওনাদের সবাইকে পাতিয়ালী যাত্রীর বেশে দেহরাদুন এক্সপ্রেসে চাপিয়ে বেনারসের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন। রাতের ট্রেনে রাসবিহারী বোস বেনারসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং তার পরের দিন সকালেই ভারী পুলিশ বাহিনী যতি কিশোরচন্দ্রের কুটীর ঘিরে ফেলল। পুলিশ রাসবিহারী বোসের সন্ধানে আশপাশের পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে চষে ফেলল, কিন্তু সিংহ ততক্ষণে খাঁচা থেকে বেরিয়ে প্রথমে বেনারস এবং তারপর সেখান থেকে সুরক্ষিত ভাবে জাপান পালিয়ে গেছিলেন। এই যতি কিশোরচন্দই পরে সন্ন্যাস নিয়ে কৃপালু মহারাজহিসেবে পরিচিত হন। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার আগুন জ্বালাবার জন্য উনি *'বিশ্ব-জ্ঞান'* নামক পত্রিকার প্রকাশনও করেন। স্বাধীনতা সেনানী এবং এক বিপ্লবীর জীবন যাপন করতে থাকা যতি কিশোরচন্দ্রজী-র যোগ এবং আধ্যাত্মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে ওঠে এবং উনি এক সিদ্ধ যোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৬৮ সালে উনি এই পৃথিবীকে চিরবিদায় জানিয়ে চলে যান।

বিপ্লব, যোগ সাধনা এবং আধ্যাত্মের পুণ্য ভূমি কৃপালু বাগ আশ্রমের সঞ্চালন কার্য এরপর মহারাজজীর শিষ্যেরা সামলে নেন। এই পরম্পরারই এক যোগসূত্র হচ্ছেন শ্রী স্বামী শঙ্করদেবজী মহারাজ, যাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রী স্বামী রামদেবজী মহারাজএই আশ্রমকে যোগ, আয়ুর্বেদ, বৈদিক সংস্কৃতির দিব্য জ্যোতি দ্বারা সমুজ্জ্বল করে একে দেশ-বিদেশে, লোকমানসে,

দিকদিগন্তে বিখ্যাত করে তুলেছেন। ১৯৯৫ সালে স্থাপিত দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্টের মাধ্যমে শ্রী স্বামী রামদেবজী মহারাজ নিজের অভিন্ন সহায়কবৃন্দ এবং আত্মীয়জন, যথা — আচার্য বালকৃষ্ণজী, স্বামী মুক্তানন্দজী ইত্যাদির সহযোগে যেসব বিভিন্ন সেবা-প্রকল্পকে মূর্ত্য রূপ প্রদান করেছেন, সেগুলোর ফলে ভারতীয় জনমানস গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যার ফলে গো া টর্ভারতবষে বেদ, যোগ, আয়ুর্বেদের ত্রিবেণী প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সাধু আত্মার দিব্য প্রতাপ দ্বারা কোটি কোটি ব্যক্তি শারীরিক আরোগ্যতা, মানসিক শান্তি, আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বৌদ্ধিক চেতনার লাভ উঠিয়েছেন অথবা ওঠাচ্ছেন। স্বামী রামদেবজী-র জীবনের তো এক-একটি মুহূর্ত পূণ্য কার্যের মহানুষ্ঠানে ব্যয়িত হচ্ছে। ধর্ম, যোগ, আধ্যাত্ম, সমাজ সেবা, শিক্ষা, লোক-কল্যাণে... সব ক্ষেত্রেই উনি সমান রূপে গতিমান হয়ে রয়েছেন, তবুও এই সন্ন্যাসী নিরহঙ্কার ভাবে এমনটা মেনে চলেন যে, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র আর এসব যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু হবে... সেসবই প্রভুর দয়া এবং ইচ্ছারই ফল।

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্ট দ্বারা সঞ্চালিত সেবা প্রকল্প

এক দশকেরও কম সময়ে দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্ট নিজের বিভিন্ন সেবা প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সফলতার যে মাইলষ্টোন স্থাপিত করেছে, সেটা দেখে লোকেদের এমনটা মনে হতে লেগেছে যে, এই সব কোন দৈবী চমৎকারের থেকে কোন অংশে কম নয়। পতাঞ্জলী যোগপীঠের রূপে যে বহুমুখী প্রকল্প স্বরূপ ধারণ করছে, সেগুলোকে দেখে লোকেদের মনে হচ্ছে যে, স্বামী রামদেবজীর নিশ্চয়ই কোন দৈবী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সব হচ্ছে সেই ঈষ-নিষ্ঠা, সমর্পণ ভাব, সেবা সংকল্প, লোক-কল্যাণের মঙ্গল ভাবনারই চমৎকার, যার দ্বারা স্বামী রামদেবজী মহারাজ সদা আবেষ্ঠিত হয়ে থাকেন, প্রেরিত এবং সক্রিয় হয়ে থাকেন। দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্টের বিভিন্ন সেবা প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে এই প্রকার ঃ

যোগ সাধনা এবং যোগ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন

পূজণীয় স্বামী রামদেবজীর সান্নিধ্যে গোটা দেশ জুড়ে আয়োজিত হওয়া যোগ সাধনা এবং যোগ চিকিৎসা শিবিরগুলো এই ভ্রান্তিকে দূর করে দিয়েছে যে, যোগ কেবলমাত্র এক শারীরিক ব্যায়াম মাত্র। পূজনীয় স্বামীজী যোগকে শারীরিক আরোগ্যতা, রোগ নিবারণ, মানসিক শান্ত, আত্মবিকাশ, বৌদ্ধিক চেতনা, আধ্যাত্মিক উন্নতির আধার হিসেবে তৈরী করে যোগকে এক বিশিষ্ট এবং অলৌকিক পরিভাষা আর অর্থবত্তা প্রদান করেছেন। যোগের এই বিলক্ষণ প্রভাবের অনুভূতি নিয়মিত রূপে যোগাভ্যাস করতে থাকা সাধকদের প্রত্যক্ষ রূপে হচ্ছেও। এইসব শিবিরে মহর্ষি পতঞ্জলী প্রণীত অষ্টাঙ্গ যোগ - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এবার এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে যে, পতঞ্জলী যোগসূত্রের সাথেসাথে হঠযোগ, দর্শন, উপনিষদ, বেদ, চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি গ্রন্থের ওপর আধারিত উপযোগিতানুসার ক্রিয়াত্মক অধ্যয়ণ, স্বাধ্যায়, প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে। যোগ, ষটকর্ম, নেতী, ধৌতি, বস্তি, ত্রাটক, নৌলি এবং কপালভাতি — এই ৬টি যৌগিক ক্রিয়ার সাথে-সাথে ধ্যান যোগ এবং জপ যোগ ইত্যাদির ক্রিয়াত্মক প্রশিক্ষণ দেবার সমুচিত ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

ব্রহ্মকল্প চিকিৎসালয়

যৌগিক ষটকর্মের সাথে-সাথে আয়ুঃবর্দিক পঞ্চকর্ম *(মালিশ, স্বেদন, বমন, বিরেচন এবং শিরোবস্তি)*, শেকড়-বাকড় এবং রস-রসায়নের ওপর আধারিত আয়ুবের্দকি ঔষধি, আহার-বিহার, পথ্যাপথ্য, সন্তুলিত ব্রহ্মচর্য, ঋতু চর্যা এবং দিনচর্যাকে সম্যক করে নতুন এবং পুরোন রোগের চিকিৎসা ব্রহ্মকল্প চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে করা হচ্ছে। অ্যাকিউপ্রেশার, যোগ এবং আসন, প্রাণায়ামের প্রশিক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির নিঃশুল্ক পদ্ধতি সেই সব ব্যক্তিকে ন্যুনতম মূল্যে প্রদান করা হচ্ছে, যারা টাকা-পয়সার অভাবে ঔষধি কিনতে পারে না।

ব্রহ্মকল্প চিকিৎসালয়তে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিজ, হৃদরোগ, হাঁফানী,

মোটাপন, এ্যাসিডিটি, এ্যালার্জী, আলসার, সার্ভাইকাল, স্পণ্ডেলাইটিস, সিয়াটিকা, আর্থারাইটিস, ক্যান্সার *(প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়)* ইত্যাদি পুরোন এবং কষ্টসাধ্য রোগের চিকিৎসা বিনা শল্য চিকিৎসা *(অপারেশন)* দ্বারাই করা হচ্ছে।

পতঞ্জলী যোগপীঠে ব্রহ্মকল্প চিকিৎসালয়কে বৃহৎ রূপ প্রদান করে একে আবাসীয় ঔষধালয়ের স্বরূপও প্রদান করা হচ্ছে, যাতে রোগীরা এখানে থেকেই চিকিৎসার লাভ ওঠাতে পারেন।

পূজণীয় স্বামীজী মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, আমাদের ভরপুর প্রচেষ্টা চালানো উচিত যে, আমরা কোনদিনও রোগী হব না। যদি হয়েও পড়ি, তাহলে প্রথম রোগকে যোগ দ্বারাই নিজেকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালানো উচিত। ওষুধ যদি নিতেই হয়, তা আয়ুর্বেদিক ওষুধকেই প্রাথমিকতা দেওয়া উচিত... কারণ এটা আমাদের দেশের মাটি, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে এবং নিরাপদও বটে। তার জন্য বিশুদ্ধ রূপে নির্মিত দিব্য ফার্মেসীর গুণবত্তাযুক্ত ওষুধি হওয়াটা অত্যাবশ্যক। সুতরাং সস্তা এবং গুণবত্তাযুক্ত ঔষধি প্রদান করার জন্য দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্ট দিব্য ফার্মেসীর স্থাপনা আশ্রম পরিসরেই করেছে, যেখানে শুদ্ধ, গুণবত্তাযুক্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা স্বানুভূত যোগ, ভস্ম ও পিষ্টী, স্বর্ণঘটিত যোগ এবং রস, রসায়ন, বটি, গুগগুল, চূর্ণ, অবলেহ, সত, ক্বাথ, ঘি, তেল, লৌহ, মন্ডুর, পর্পটি ইত্যাদি তৈরী হয়। আমাদের পূর্ণ প্রয়াস এটা হচ্ছে যে, ঔষধি শুদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় বিধিতে নির্মিত উচ্চ গুণবত্তাযুক্ত হোক্। তার সাথে আমাদের প্রচেষ্টা এটাও থাকে যে, ন্যুনতম মূল্যে জনসাধারণ যেন সেই সব ঔষধি প্রাপ্ত করে। আমরা সীমিত মাত্রাতেই ঔষধি নির্মিত করতে পারছি, এই কারণে বেশ কয়েকবার লোকেদের ঔষধি না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব, দিব্য ফার্মেসীর বিস্তার করার যোজনাকে কার্যরূপ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে আপনাদের সবার আবশ্যকতা এবং আমাদেরপ্রতি আপনাদের যে ভাবনা রয়েছে, সেটাকে আমরা পূর্ণ করতে পারি।

অনুসন্ধান কক্ষ (ল্যাবোরেটারী)

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্টের নিজস্ব এক অনুসন্ধান কক্ষ রয়েছে, যার কাজ হচ্ছে পরম্পরাগত ঔষধি ছাড়া নতুন ঔষধীর আবিষ্কার করা, বহু বছর ধরে অপ্রাপ্ত ঔষধিকে খোঁজা, দিব্য ফার্মেসীর জন্য কেনা বনৌষধিগুলোর গুণবত্তা পরীক্ষা করা, শাস্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা ঔষধ নির্মাণ সুনিশ্চিত করা, চিকিৎসা এব ফার্মেসী জগতে হওয়া অনুসন্ধান এবং আরও উন্নত হতে থাকা প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যয়ন এবং সম্যক তথ্য প্রাপ্ত করা, আয়ুবের্দের ওপরে লিখিত এবং প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তকালয়ের জন্য ক্রয় করা, ঔষধীয় গাছ-গাছালির সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন করা, ব্যবসায়িক লাভের ওপরে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সাহিত্য প্রস্তুত করে প্রকাশিত করা। অনুসন্ধান কক্ষ এর মধ্যেই বেশ কিছু স্বানুভূত যোগ তৈরী করে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে। অসংখ্য বছর ধরে অষ্টবর্গের চার ঔষধীয় গাছ-গাছালীর অপ্রাপ্ততার ভিত্তিতে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই সব গাছ-গাছালী প্রাকৃতিক কারণে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে... কিন্তু এই অনুসন্ধান কক্ষের মনীষীরা অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর আগ্রহ এবং একান্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে হিমালয়ের শীতপ্রধান এলাকা থেকে এই চারটে বিলুপ্ত ঔষধিকে খুঁজে বের করেছেন। অষ্টবর্গের ওপরে ট্রাষ্ট দ্বারা ইংরেজি এবং হিন্দীতে প্রকাশিত পুস্তকে এই উল্লেখনীয় আবিষ্কারের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

দিব্য ঔষধ বাটিকা

হিমালয় ক্ষেত্র সমেত দেশ-বিদেশে পাওয়া যাওয়া উপযোগী, দুর্লভ এবং সুলভ জীবনদায়িনী শেকড়-বাকড়ের পরিজ্ঞান, সংরক্ষণ এবং সংবর্ধনের জন্য শুরু থেকেই আশ্রম পরিসরে সার্থক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু স্থানাভাবে সেটাকে বৃহৎ এবং বাঞ্ছিত রূপ প্রদান করা যায় নি। এখন পতঞ্জলী যোগপীঠে এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত জমি রয়েছে, সুতরাং বিশাল স্তরে সেই সব শেকড়-বাকড় গজানোর যোজনা তৈরী করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য যেসব ঔষধীয় গাছ-গাছালীর তাজা পাতা, রস, মূল বা ফলের প্রয়োজন হয়, সেগুলো এই দিব্য ঔষধ বাটিকা দ্বারা

নিকট ভবিষ্যতে পূরণ করা হবে। টবে লাগানো গাছ-গাছালী এবং বীজ বিক্রীর জন্যও পাওয়া যাবে।

দিব্য গোশালার স্থাপনা

ভারতীয় প্রজাতির দেশী গরুদের সংরক্ষণ, সংবর্ধন এবং ঔষধ নির্মাণে উপযোগী গো-দুগ্ধ, গো-ঘৃত, গো-মূত্র, গোময় ইত্যাদির প্রাপ্তির জন্য গো-সেবা এবং গো-বংশের রক্ষা করার প্রকল্প আশ্রমে আগে থেকেই চলে আসছে, কিন্তু এখন পতঞ্জলী যোগপীঠে সেটাকে বৃহৎ রূপ প্রদান করা হচ্ছে, যেখানে বেশ কয়েক হাজার গরুর পালন-পোষণ করা হবে। এতে প্রাপ্ত গোবর থেকে কম্পোষ্ট অথবা জৈবিক সার প্রস্তুত করে প্রয়োগে আনা হবে, যাতে রাসায়নিক উর্বরক রহিত অন্ন, ফল, সব্জী এবং দুধ পাওয়া যাবে। গোবর থেকে বায়োগ্যাস (biogas)-ও প্রস্তুত করা হবে, যাতে আশ্রমের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ হতে পারবে। এই সব দেশী গরুর উপযোগ প্রজাতি উন্নতির জন্য করা হবে, যাতে গো-বংশকে প্রতিষ্ঠা এবং প্রামাণিকতা প্রদান করা যায়।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান (অগ্নিহোত্র)

অগ্নিহোত্র বস্তুতঃ নিজেই এক বিজ্ঞান। পরিবেশ শোধন এবং সন্তুলন বজায় রাখার কাজে, ঋতুদের অনুকূল বানিয়ে রাখার কাজে, গাছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের জন্য, অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য, কয়েকটি রোগের চিকিৎসা করার জন্য এবং ধার্মিক আর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের প্রতিপূর্তির জন্য অগ্নিহোত্রের ভারতীয় পরম্পরায় এক বিশেষ স্থান রয়েছে। এই ঋষি পরম্পরাকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে আশ্রমে প্রতি দিন যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। পতঞ্জলী যোগপীঠ পরিসরে এক বিশাল যজ্ঞশালার নির্মাণ প্রস্তাবিত রয়েছে। যজ্ঞের উক্ত লাভকারী বিন্দুগুলোর ওপরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্য্যও হবে।

বৈদিক গুরুকুল

হরিয়াণার রেবাড়ী শহর থেকে প্রায় ৮ কিমি দুরে কিশনগড়-ঘাসেড়াতে বৈদিক সংস্কৃতি সংস্কার আর উচ্চাদর্শ এবং উন্নত, আধুনিক শিক্ষাযুক্ত নিঃশুল্ক বিদ্যাতীর্থ গুরুকুলের সঞ্চালন করা হচ্ছে, যাতে উচ্চ বর্গের

সাথেসাথে গ্রামীণ এবং গরীব বাচ্চাদের সুসংস্কারের সাথে ভালো শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এখনও গুরুকূলে ভবন নির্মাণ ইত্যাদির আবশ্যকতা রয়েছে, যাতে আরও অধিক সংখ্যায় বাচ্ছা শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে পারে।

গঙ্গোত্রী স্থিত সাধনা আশ্রম

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্ট কৌতূহলী সাধক-সাধিকাদের এবং হিমালয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দুর্লভ শেকড়-বাকড় অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণের জন্য গঙ্গোত্রীতে আশ্রমের স্থাপনা করেছে, যেটার এখনও বিস্তৃত এবং বৃহৎ স্বরূপ প্রদান করা বাকী আছে।

পতঞ্জলী যোগপীঠের স্থাপনা

পতঞ্জলী যোগপীঠ, মাতৃ সংস্থা দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্ট, কনখলের এক বহুমুখী যোজনা, যেটা প্রায় এক হাজার বিঘা জমির ওপরে মূর্ত রূপ গ্রহণ করবে। যোগপীঠ বেদ, যোগ, আয়ুর্বেদের প্রচার-প্রসার, প্রশিক্ষণ, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রায় দু হাজার সাধক-সাধিকা এই পীঠের মাধ্যমে আবাসীয় সুবিধা প্রাপ্ত করবেন। প্রায় আড়াই হাজার কামরা এবং হল সম্বলিত এই ভবনের এক বিশাল পরিসর সৃষ্টি হবে...যাতে ফার্মেসী, হাসপাতাল, গোশালা, শেকড়-বাকড়ের উদ্যান, যোগ সন্দেশ এবং সাহিত্য প্রকাশন এবং বিক্রয় অনুসন্ধান বিভাগ, পুস্তকালয়, মুদ্রণালয়, অন্নপূর্ণা, যোগ-কেন্দ্র, যজ্ঞশালা ইত্যাদি আধুনিক সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। এই পরিসরে আসা ব্যক্তিদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভোজন প্রদান করা হবে, যেটা এল.পি.জি. গ্যাস, রাসায়নিক উর্বরক এবং কীটনাশক থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হবে। এই পরিসর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের মতই পূর্ণ রূপে আত্মনির্ভর এবং স্বাবলম্বী পরিসরের রূপে বিকশিত হয়ে কোটি-কোটি লোকের জন্য আরোগ্যতা, যোগাভ্যাস, মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের শ্রদ্ধাময়ী তপোভূমি রূপে লোক-বিশ্রুত সংস্থানের স্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে। একশো কোটি টাকার এই অত্যন্ত বিশাল বহুমুখী যোজনাকে ভারতের কোটি কোটি যোগ সাধক-সাধিকাদের আর্থিক সহযোগেই পূরণ করার শিব সংকল্প স্বামী রামদেবজী নিয়েছেন, যেটা পরমপিতা পরমাত্মার অসীম প্রেরণা এবং কৃপায় লাগাতার পূর্ণ হয়েও চলেছে।

এই যোগপীঠের সদস্যতা গ্রহণ করার জন্য যে সহযোগ রাশি ট্রাষ্ট নির্ধারিত করেছে, সেটা হল এই প্রকার ঃ

১.	সংস্থাপক সদস্য	পাঁচ লাখ টাকা
২.	সংরক্ষক সদস্য	দু লাখ একান্ন হাজার টাকা
৩.	আজীবন সদস্য	এক লাখ টাকা
৪.	বিশিষ্ট সদস্য	একান্ন হাজার টাকা
৫.	সম্মানিত সদস্য	একুশ হাজার টাকা
৬.	সাধারণ সদস্য	এগারো হাজার টাকা

যোগ সন্দেশ (মাসিক পত্রিকা)-র প্রকাশন

দিব্য যোগ মন্দির ট্রাষ্টের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার সাধক-সাধিকা দ্বারা বহু দিন থেকে করে আসা দাবীকে মেনে নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে অভিজ্ঞ সম্পাদক মন্ডলীর সম্পাদনায় *'যোগ সন্দেশ'* পত্রিকার প্রকাশন শুরু করা হয়েছে। প্রতি মাসে হাজার-হাজার নতুন পাঠক-পাঠিকার সদস্য হওয়াটা এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অদূর ভবিষ্যতে আর্য পম্পরা থেকে প্রাপ্ত যোগ, আয়ুর্বেদ, সংস্কৃতি-সংস্কার এবং আধ্যাত্মবাদী বিচারধারাকে অসংখ্য পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কবিতা, লোকোপোযোগী রচনা, ট্রাষ্টের গতিবিধি, ভবিষৎ যোজনা এবং পাঠকদের প্রতিক্রিয়াকেও পত্রিকায় যথোচিত ভাবে সমাবেশ করা হবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন পত্রিকার এত তীব্র গতিতে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা পরম পূজনীয় স্বামী রামদেবজী মহারাজের বিলক্ষণ প্রভাবেরই পরিণাম।
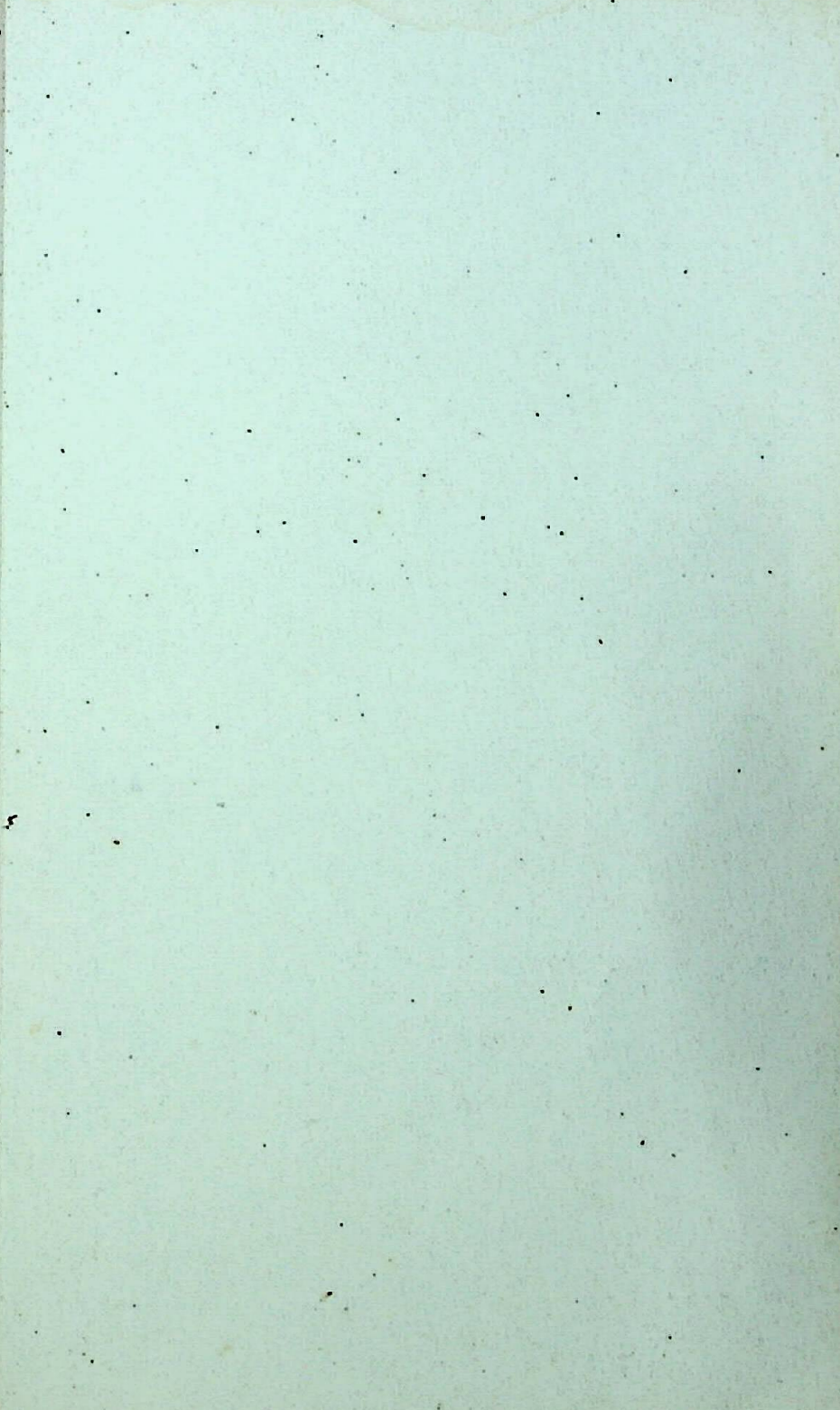
শ্রদ্ধেয় স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত

পূজনীয় স্বামী রামদেবজী মহারাজ জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য প্রতাপ দ্বারা বাল ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ সমেত বৈদিক দর্শনের মহান মনীষী, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তিতিক্ষু সন্ন্যাসী। উনি বেদের প্রকাণ্ড বিদ্বান, পরম তপস্বী, কর্মযোগী ঋষি, আচার্য শ্রী বলদেবজী মহারাজ গুরুকুল কালবার শিষ্য। নিজের ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকেই, পূজনীয় তপস্বী অনাসক্ত সাধু শ্রী শংকরদেবজী মহারাজের থেকে ভাগীরথির পবিত্র তটে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অষ্টাধ্যায়ী, মহাভাষ্য এবং দর্শনোপনিষদাদি গ্রন্থগুলো উনি বিভিন্ন গুরুকুলে পড়িয়েছেন। হিমালয়ে বিচরণ করতে-করতে গঙ্গোত্রীর পবিত্র গুহাগুলোয় তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মারাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে হরিদ্বারে নিজের পরম তপস্বী বিদ্বান বন্ধু এবং আয়ুর্বেদের মহান মনীষী, গবেষক আচার্য শ্রী বালকৃষ্ণ-কে সঙ্গে নিয়ে ১৯৯৫ সালে পবিত্র তীর্থ কনখলে দিব্য যোগ মন্দির (ট্রাষ্ট)-এর স্থাপনা করে সাধনা করতে করতে আরোগ্য, আধ্যাত্মিক এবং শৈক্ষনিক সেবা প্রকল্পগুলো শুরু করেন।

ওনার পবিত্র সান্নিধ্যে আয়োজিত শতাধিক যোগ সাধনা এবং যোগ চিকিৎসা শিবিরগুলোয় লক্ষ্য ব্যক্তি অসাধ্য রোগের হাত থেকে মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক মার্গ দর্শন করেছেন। আশ্রমের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ইত্যাদি সেবা কার্যে প্রতি বছর অসংখ্য ব্যক্তি শরীর-মনের স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত করেছেন। হরিদ্বারের পুণ্য ভূমিতে যোগ এবং আয়ুর্বেদের প্রাচীন পরম্পরার ভিত্তিতে নির্মানাধীন পতঞ্জলী যোগপীঠ যোগ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান সংস্থানের স্থাপনাও উনি করেছেন। উনি হরিয়াণার রেবাড়ী জেলায় বৈদিক সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষার ওপরে আধারিত এক বিশাল আবাসীয় গুরুকুল কিশনগড় ঘাসেড়ার সঞ্চালন করছেন। শুধুমাত্র ফলাহারের ওপরে আশ্রিত ওনার তপস্বী, সরল, সহজ, স্নেহময়, যোগময় ব্যক্তিত্ব সবার শ্রদ্ধার কেন্দ্র। সেবা এবং সাধনায় অহর্নিশিরত উনি আমাদের সবার প্রেরণাস্রোত, বন্দনীয়, শ্রদ্ধেয় এবং অনুকরণীয়।

আচার্য বালকৃষ্ণ

Price : Rs. 50/- (US$5)

8 904049 800145